# সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● চতুর্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ● অক্টোবর ২০১৮ ● পাঁচ টাকা


## ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিপন্থী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেছেন, "প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বেশ কিছু ধারা গণতন্ত্র, বাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিপন্থী।"

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বশীলতা বাড়ানোর কথা বলে যে আইন তৈরি হতে যাচ্ছে তা বাস্তবে নাগরিকদের মত প্রকাশের অধিকার হরণ করবে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ১৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল ২০১৮-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে। আইনের ৩২ ধারার বহুল সমালোচিত 'ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তি' শব্দবন্ধে ভাষাগত পরিবর্তনের কথা বলা হলেও বিষয়বস্তু প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কথা উল্লেখ করলেও ঔপনিবেশিক আমলের অফিসিয়াল সিক্রেসি এক্টকে যুক্ত করা হয়েছে, অথচ দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। নতুন আইনে মুক্তিযুদ্ধ, জাতির পিতা, ধর্ম অবমাননা, রাষ্ট্রের সুনাম ক্ষুণ্ন করা, মানহানির মতো সাইবার অপরাধের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে সাজার বিধান রাখা হয়েছে। 'রাষ্ট্রের সুনাম' 'ভাবমূর্তি', 'ধর্মীয় অনুভূতি' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' – এসব শব্দ আইনে ব্যবহৃত হলে সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়ার দরকার হয়ে পড়ে। এসব ধারণার কি অভিন্ন এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণের উপায় আছে? এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল ও নিরাপত্তা এজেন্সি গঠনের কথা বলা হয়েছে। সংসদীয় কমিটির প্রস্তাবে অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা আগের তুলনায় কিছুটা কমানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও নতুন আইনের ১৪টি ধারার অপরাধ জামিন অযোগ্য। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলেছেন, বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম এ আইন তৈরি করতে যাচ্ছে।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আরো বলেন, "আইনের ৮ ধারায় বলা হয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করলে ওই তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ক্ষেত্রমত ব্লক করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি অনুরোধ করতে পারবে। ওই ধারায় আরও বলা হয়েছে, যদি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে মনে হয় যে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য দেশের বা দেশে কোন অংশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে বা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঞ্চার করে তাহলে বাহিনী ওই তথ্য-উপাত্ত ব্লক বা অপসারণ করতে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মাধ্যমে বিটিআরসিকে অনুরোধ করতে পারবে।

আইনের ১৭ ধারায় বলা হয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কেউ যদি *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

# বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বামপন্থীদের করণীয়

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ ও বিক্ষুব্ধতার পারদ এখন থার্মোমিটারের সবচেয়ে উপরের স্কেলে। কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে দু'টি দাবিভিত্তিক আন্দোলন হলেও দাবির পরিসরে তা সীমাবদ্ধ থাকেনি। সরকারের চূড়ান্ত দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের সীমাহীন বিক্ষোভ এর সাথে যুক্ত হয়েছিল। ঘটনা দু'টি প্রমাণ করে দিয়েছে যে মানুষ আন্দোলন চায়, চায় সাহসের সাথে কেউ দাঁড়াক, লড়ুক। এ কারণে কিশোরদের আন্দোলনে রাস্তা যখন বন্ধ, ঢাকা যখন অচল– তখনো মানুষের মুখে বিরক্তি নয়, বরং এই কিশোরদের প্রতি সমর্থনই ব্যক্ত হয়েছে। এটি শুধু দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের প্রতিক্রিয়া নয়, কারোরই বুঝতে অসুবিধা নেই এটি গত দশ বছর ধরে চলতে থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের ফ্যাসিবাদী শাসনের ফলাফল। ক্ষোভ-বিক্ষোভ বারুদ হয়ে জমে আছে সমাজের স্তরে স্তরে – একটু আগুনের কণা পেলেই তা বিস্ফোরিত হতে চায়।

এই পরিস্থিতিতে দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে এসেছে। আওয়ামী লীগ যে কোন প্রকারে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়, অথচ এই মূহুর্তে তার কোন জনভিত্তি নেই। আপাত অর্থে সুষ্ঠু নির্বাচন (বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এর বেশি আশা করা যায় না) হলে আওয়ামী লীগের আবার ক্ষমতায় আসার কোন উপায় নেই। দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে চায় না। প্রতিটি সেক্টরেই সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমে আছে, ফাঁক পেলেই তা বিস্ফোরিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় ক্ষমতায় আসতে হলে আওয়ামী লীগকে আরেকটি সাজানো নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে। *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

## সংসদ ভেঙে দিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে

# বাম গণতান্ত্রিক জোটের সচিবালয় ঘেরাওয়ে পুলিশি বাধা

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক দুঃশাসন-জুলুম-লুটপাটের প্রতিবাদে, জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে অবাধ-নিরপেক্ষ-গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট ১৪ অক্টোবর পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময় বাসদ (মার্কসবাদী) নগর শাখার নেতা নাঈমা খালেদ মনিকা সহ ৩০ জনের অধিক আহত হয়। (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

## শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, ছাত্র সংসদ নির্বাচন, পিইসি পরীক্ষা বাতিল ও নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবিতে

# সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৫ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, ডাকসুসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন, পিইসি পরীক্ষা বাতিল ও নিরাপদ ক্যাম্পাসসহ সাত দফা দাবিতে ২৬ সেপ্টেম্বর সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৫ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১১ টায় অপরাজেয় বাংলায় সম্মেলন উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। সংগঠনের সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টুর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা নিত্রা।

উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রায় দুই সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে একটি সুদৃশ্য র‍্যালী বিশ্ববিদ্যালয় ও নগরীর রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

বিকাল ৪ টায় রাজু ভাস্কর্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ(মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানজিমউদ্দিন খান, অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের সভাপতি কমল সাঁই।

সম্মেলনে মাসুদ রানাকে সভাপতি, জয়দীপ ভট্টাচার্যকে সহ-সভাপতি, রাশেদ শাহরিয়ারকে সাধারণ সম্পাদক ও তাজনাহার রিপনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সবশেষে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে।


**বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে** পৃষ্ঠা-৩

**গোবিন্দপুরে চাষী আন্দোলনে জয়** পৃষ্ঠা-৫

**ইয়েমেন সংকট:** পৃষ্ঠা-৮

**প্রসঙ্গ আসাম** পৃষ্ঠা-৮

# বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বামপন্থীদের করণীয়

*(১ম পৃষ্ঠার পর)* আওয়ামী লীগ আরেকটা সাজানো নির্বাচনের দিকেই এগোচ্ছে, কিন্তু প্রতিরোধ করার মতো কোন বিরোধী শক্তি নেই

এই সাজানো নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকেই আওয়ামী লীগ যাচ্ছে। এছাড়া তাদের কোন উপায়ও নেই। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তারা এই সাজানো নির্বাচনের মহড়া দিয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এর নাম দিয়েছেন 'নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন'। একই মডেল আওয়ামী লীগ জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে। প্রশ্ন হলো দেশের অপরাপর বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি জনগণকে সংঘবদ্ধ করে এই প্রহসনের নির্বাচন ঠেকাতে পারবে কি না? জনগণকে সাথে নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে আবার একটা অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসা আটকাতে পারবে কি না?

জনগণের অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ একে ঠেকাতে পারবে না। এই অসন্তোষ ও বিক্ষুব্ধতাকে স্থায়ী আন্দোলনে রূপ দিতে পারে এমন কোন নেতৃত্বও এই মূহুর্তে এদেশে নেই। বিএনপি প্রধান বিরোধী দল হলেও অসংগঠিত। তাদের নেত্রী খালেদা জিয়া জেলে। গোটা দলকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা আন্দোলন কিংবা নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে এমন গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি এ দলে নেই। ফলে সরকারের এত ব্যর্থতার পরও বিএনপি দাঁড়াতে পারছে না। জনদাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলা বিএনপি'র লক্ষ্য নয়, কারণ সে বিপ্লবী শক্তি নয়। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থেও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য, নির্বাচনে লড়ার জন্য যে মনোভাবের প্রয়োজন হয়, যে ঝুঁকি নিতে হয় – এই মূহুর্তে সেটাও তারা দেখাচ্ছে না। তাদের নেতারা রাজপথে নামলে, রাস্তায় মার খেয়ে পড়ে থাকলে মানুষের ঢল তাদের দিকেই যেতো, কারণ বুর্জোয়া মিডিয়ায় সরকারবিরোধী যতটুকু প্রচার-প্রচারণা সেটার কেন্দ্র তারাই। কিন্তু বিএনপি কোন সংবাদই সৃষ্টি করতে পারছে না।

### ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিকল্প হিসেবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষিত-সচেতন-গণতান্ত্রিক চিন্তাসম্পন্ন মানুষেরা মৌলবাদের প্রসার নিয়ে খুবই চিন্তিত। এই সময়ে বেশ কিছু জায়গায় জঙ্গী হামলার ঘটনা ঘটছে। লেখক-ব্লগার-প্রকাশকদের উপর একের পর এক হামলা হয়েছে। এর পুলিশি তদন্তে দেখা গেল যে এই নেটওয়ার্ক বেশ সংগঠিত ও শক্তিশালী এবং দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় তাদের যোগাযোগ আছে। এদের রিক্রুটমেন্টের উৎস এখন শুধু মাদ্রাসা ছাত্র নয়, ঢাকার উচ্চবিত্ত ঘরের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছাত্ররাও এদের সাথে যুক্ত। প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা কিংবা সচিবদের সন্তানদেরও এখন আত্মঘাতী স্কোয়াডের নেতৃত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে। একইসাথে হেফাজতে ইসলামসহ মৌলবাদী শক্তিগুলোর যৌথ মহড়া মানুষের মনে মৌলবাদের উত্থানের শঙ্কা জন্ম দিয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা তীব্র বিক্ষোভ নেতৃত্বহীন অবস্থায় বসে থাকতে পারে না। সঠিক বিপ্লবী শক্তি সেটা ধারণ না করলে কারও না কারও ভোটের বাক্সে সে জমা হবে কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি একে ব্যবহার করবে।

তবে ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তিগুলো স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে জেতার মতো সামর্থ্য এখনও অর্জন করেনি। এদেরকে কেন্দ্র করে দেশে কোন গণজোয়ারও সৃষ্টি হয়নি। যদিও ধর্মীয় মৌলবাদের প্রচার ও নতুন করে ধর্মীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার একটা ঝোঁক ইদানিংকালে বেশ চোখে পড়ার মতো। এর কারণ শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও এই প্রেক্ষাপট সৃষ্টির জন্য দায়ী। মুসলমানরা সন্ত্রাসী ও দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি – গোটা বিশ্বে এটাই এখন মুসলমানদের পরিচিতি। আমেরিকা ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে তৈরি করেছে আবার এখন তারাই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে, মুসলমানদের এক নম্বর জাতীয় শত্রু হিসেবে গণ্য করছে। এতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাধারণ মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অভিবাসী মুসলমানদের প্রতিনিয়ত অপমানিত হতে হচ্ছে। এই অবমাননাবোধ থেকে সঠিক রাস্তা না পেয়ে যুব সমাজের একটা অংশ ইসলামী জঙ্গীবাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু এটা দেশের মধ্যে একটা জাগরণ তুলে ইসলামী বিপ্লবের দিকে দেশকে নিয়ে যাবে – অবস্থাটা এরকম হয়নি।

### বামপন্থীদের নেতৃত্বে সৃষ্ট গণআন্দোলই এ সময়ে পথ দেখাতে পারতো, কিন্তু তাদের বড় অংশই ভোটের রাজনীতিতে মগ্ন

বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে উঠলে এই জনবিক্ষোভ একটা সঠিক রাস্তা পেতো। জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংগ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে বামপন্থীরা সত্যিকারের লড়াই গড়ে তুলতে পারলে, জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে শুধু প্রতিক্রিয়াধর্মী কর্মসূচী নয়, জনগণকে সাথে নিয়ে কার্যকর আন্দোলনের চেষ্টা করলে বামপন্থীরা ধীরে ধীরে দেশের মানুষের ভরসার কেন্দ্রে আসতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। বামপন্থীদের অনেকেই আন্দোলন-সংগ্রামের এই ধারাবাহিক ও কষ্টকর পথ বাদ দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে কিছু পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টাই করছেন। বিশেষ করে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটে, যেখানে জনগণকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে একটা গভীর শূন্যতা বিরাজ করছে, সেখানে নির্বাচনী বিকল্প হিসেবে এই বামপন্থীরা আসতে চাইছেন। বামপন্থীরা জনগণের নেতা হয়ে উঠুক তা আমরাও চাই, কিন্তু সেটা কিভাবে? বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট শূন্যস্থানে কৌশলী ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হওয়ার মাধ্যমে – যা প্রকান্তরে বুর্জোয়াদের 'এসকেপ রুট' হবে? নাকি তারা তাদের নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করবে?

বাসদ (খালেকুজ্জামান) ও বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেছেন মাহমুদুর রহমান মান্নার নেতৃত্বাধীন নাগরিক ঐক্য, বদরুদ্দোজার বিকল্প ধারা, ড. কামাল হোসেনের গণফোরাম, কাদের সিদ্দিকীর কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগ ইত্যাদি দলগুলোর সাথে বামপন্থীদের একটা জোট গঠনের মাধ্যমে একটা বিরাট জোট হিসেবে প্রচারে আসতে, রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে একটা জায়গা নিতে। কামাল হোসেন-বদরুদ্দোজাদের নাম-ধাম আছে এবং মিডিয়া এদের বেশ প্রচারও দেয় – তারা সেটা ব্যবহার করতে চেয়েছেন। আবার বামপন্থীদের ব্যক্তিগত সততা নিয়ে জনগণের মধ্যে একটা ইমেজ আছে। বাসদ, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টিসহ কিছু বামপন্থী দল মনে করেছেন যে, কামাল হোসেন-বদরুদ্দোজাদের প্রচার এবং জনগণের মধ্যে বামপন্থীদের ইমেজ – এই দু'টোকে কাজে লাগিয়ে তারা জনগণের আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাবটাকে একটা জায়গা দিতে পারবেন এবং নির্বাচনেও একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারণকারী ফ্যাক্টর হিসেবে উপস্থিত হতে পারবেন।

বাস্তবে এই তথাকথিত উদারপন্থীরা জনগণের দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে রাস্তায় দাঁড়ালে, প্রতিটি ইস্যুতে প্রতিবাদ করলে, জনগণের ঘরে ঘরে গেলে – আমরা কি বলছি না বলছি তার উপর কিছু নির্ভর করতো না – মানুষ এই গভীর সংকটে তাদের কাছে টেনে নিতোই এবং যারা আন্দোলন চায় তাদের সকলকেই এই শক্তিগুলোর সাথে যুক্ত হতে হতো। বামপন্থীদের তাদেরকে টেনে টেনে আন্দোলনে আনতে হতো না। আন্দোলনভিত্তিক ঐক্য এভাবেই গড়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কতিপয় বামপন্থী বন্ধুরা তা বুঝতে পারলেন না। যে কোন শক্তি, যে রাষ্ট্রের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আন্দোলনে নামবে, রুখে দাঁড়াবে– তখন তার সাথে ঐক্য হবে কি হবে না সে প্রশ্ন আসে। কিন্তু শুধু গোলমিটিং করে পত্রিকায় ছবি ছাপতে থাকলে, এই আমরা নামছি এমন ভাব দেখালে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

তাহলে বামপন্থী দাবিদার দলগুলো এই ধরনের চিন্তা করেন কেন? আন্দোলন মাথায় থাকলে এই সকল যুক্তি আসার কথা নয়। প্রকৃত সত্য এই যে, এই ধরনের বিশ্লেষণ আসার পেছনে একমাত্র কারণ হলো, এই বামপন্থীদের মনে অন্দোলন থেকে নির্বাচনই বেশি প্রাধান্য নিয়ে আছে। তারা নির্বাচনে যোগ্যতা প্রমাণের জন্য ও মানুষের সামনে 'দৃশ্যমান' হওয়ার জন্য আন্দোলন করেন।

অথচ কে না জানে, এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে ভোট যত সুষ্ঠুই হউক না কেন বাস্তবে তা মানি-মাসল-মিডিয়ার প্রভাবাধীন। সুষ্ঠু বলা হচ্ছে মানে এসব কিছুর প্রভাবের মধ্যে জনগণ অন্তত নিজে নিজের ভোটটা কেন্দ্রে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছেন। সেটাকেই মহাসমারোহের সাথে বলা হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন। এই নির্বাচনের ভীড়ে বামপন্থীরা জায়গা নিতে চান, তার জন্য মাথাটা গলিয়ে দেয়া শুরু করেছেন। অথচ সারা দেশে তাদের সংগঠন দাঁড়ায়নি, দেশের প্রান্তে প্রান্তে জনগণের বিভিন্ন দাবিতে লড়াই করতে করতে তাদের একঝাঁক নেতা তৈরি হয়নি, জনগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বড় একদল সমর্থক সৃষ্টি হয়নি। এই সকল প্রস্তুতি থাকলেও মানি-মাসল-মিডিয়ার নির্বাচনে তাদের এক-দুইটি আসনে জেতাও কষ্টকর হতো। অথচ এর কিছুই ঘটলো না, বামপন্থীদের উদ্যোগে অতি অল্প কাজ হয়েছে মাত্র, এর মধ্যেই তাদের মধ্যে ভোটের স্বপ্ন খেলা করতে শুরু করলো। একটা বড় জোট যদি বামপন্থী ও কামাল হোসেন-বদরুদ্দোজাদের নিয়ে হয়, আর বুর্জোয়া মিডিয়া যদি একে বেশ প্রচার দেয়া শুরু করে, তাতে বেশ কিছু মানুষের মনে একটা কিছু হচ্ছে বলে যদি একটা ভাবও তৈরি হয় – তবে বুঝতে হবে যে সেটা বুর্জোয়াদের সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই হচ্ছে, আন্দোলনের জন্য হচ্ছে না।

### রাজনীতি ও নির্বাচন শ্রেণী নিরপেক্ষ কোন ব্যাপার নয়

নির্বাচন শ্রেণীর সার্বিক পরিকল্পনার বাইরের কোন ব্যাপার নয়। দেশের ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিশ্রেণীর এখানে নির্ধারণকারী ভূমিকা আছে। বিশেষ করে দেশে যখন কিছু একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, তখন তাদের ব্যবসার স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য যাকে দরকার, যাকে দিয়ে তার কাজ সবচেয়ে ভাল হবে তাকেই সে ক্ষমতায় আনবে। এ কারণেই ব্যবসায়ী-পুঁজিপতি শ্রেণী আওয়ামী লীগকে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এনেছিল। দেশের মানুষ না মানলেও এই শ্রেণীর সমর্থনের জোরেই আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পেরেছে। খালেদা জিয়াকে পরিকল্পিতভাবে সে জেলে পুরে রাখতে পারলো, এর বিরুদ্ধে কোন প্রকার কার্যকর আন্দোলন বা প্রতিক্রিয়া বিএনপি দেখাতে পারলো না – তা এই শ্রেণীর কারণে। একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর সকলে একমত হয়ে এই কাজ করছে কিনা সেটা বড় প্রশ্ন নয়, ঘটনাগুলো সেভাবে ঘটেও না। কিন্তু এটা ঠিক যে এদের একটা বড় অংশের সমর্থন না পেলে বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় কোন শক্তি আসতে ও টিকে থাকতে পারে না।

অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশ হওয়ায় এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের একটা ভূমিকা থাকে। এই মূহুর্তে এদেশে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের উপর ভারত তার পূর্বের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। ভুটানে ধীরে ধীরে চীন ঢুকছে, ভুটানের যুবসমাজের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব বাড়ছে। একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে এ অঞ্চলে প্রভাব ধরে রাখতে হলে বাংলাদেশকে সে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দিতে পারে না। ভারত আওয়ামী লীগ সরকারকে এতদিন পুরোপুরি সমর্থন করে এসেছে। এদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক আছে, বিভিন্ন প্রশাসনিক ও পররাষ্ট্রবিষয়ক পদক্ষেপে সরাসরি ভারতের প্রভাব আছে। বাংলাদেশ-আমেরিকা সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে আমেরিকার একমাত্র মিত্র ভারত। সেকারণে বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতের সাথে কোন দ্বন্দ্বে আমেরিকা যাচ্ছে না। চীন বিরাট ব্যবসা পাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে, কিন্তু কৌশলগত কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, ব্যবসার বাইরে রাজনৈতিক বিষয়ে সে এখনও যুক্ত হয়নি। রাশিয়ার সাথে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের ব্যাপারে বাংলাদেশের বড় বড় চুক্তি হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে কেউই আওয়ামী লীগের ব্যাপারে নাখোশ নয়। সবাইকেই সে খুশি রেখেছে। শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই সরকারকে অন্যদের মতো করে সমর্থন করছে না। তারা ২০১৪ সাল থেকেই এই সরকারের বৈধতার ব্যাপারে তাদের প্রশ্ন উত্থাপন করে আসছে এবং বিভিন্ন সময়ে সরকারের মানবাধিকারবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছে। তবে ইংল্যান্ড এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে আমেরিকার সাথে ঐক্যবদ্ধ।

### ভারতের অবস্থান একই জায়গায় আগের মতো করে নেই

ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। সম্প্রতি বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার ও ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীর একটা নিবন্ধ বেরিয়েছে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ প্রকাশ করে এমন একটি পত্রিকায়। এতে তিনি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা চিত্র এঁকে, বিভিন্ন ফ্যাক্টর আলোচনা করে সবশেষে বলেছেন, "ঢাকায় যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন ভারত তার সাথে কাজ করবে। তাই বলে কোন হাসিনাবিরোধীকে ভারত বিকল্প মনে করছে, এমন কিছু ভাবা হবে কষ্টকর কল্পনা। অবশ্য হাসিনার স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা ও তার প্রতি ভারতের সমর্থন অনিবার্য মনে করাটা ভারতের স্বার্থের অনুকূল নয় – ভারতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ক্রমেই এমন অনুভূতিও জোরালো হচ্ছে।" এ থেকে স্পষ্ট একটা বার্তা যায় যে, আগে যেমনই হউক, হাসিনার সবকিছুকেই এ সময়ে ভারত চোখ বন্ধ করে সমর্থন করবে না।

### জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের 'মৌলবাদের হুমকি' ও 'মন্দের ভাল' তত্ত্ব

মানুষ আওয়ামী লীগকে একেবারেই চাইছে না। প্রতিটি জনবিস্ফোরণ বার্তা রেখে যাচ্ছে, এই সরকারকে তারা মানছে না। কিন্তু বিক্ষুব্ধ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনে নামাবে এরকম কোন শক্তিও সংগঠিত অবস্থায় এখন উপস্থিত নেই। বিএনপি'র সাংগঠনিক শক্তির ব্যাপারে আমরা আগেই বলেছি। আবার বিএনপি'র ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে এই প্রশ্নও আছে যে, আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপি তো ভাল কিছু নয়। তারা ক্ষমতায় গেলেও একই কাণ্ড করবে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দেশের সম্পদ লুট, প্রাকৃতিক সম্পদকে বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে পানির দামে তুলে দেয়া – ইত্যাদি সকল গর্হিত কাজ বিএনপিও করবে। তার দু'বারের দেশ শাসন তাই প্রমাণ করে। দেশের অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল এক অংশকে আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবীরা এসব যুক্তি দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। তারা দেখাচ্ছেন যে, আওয়ামী লীগ খারাপ কাজ করছে ঠিক, কিন্তু বিএনপি কোন সমাধান নয়। বিএনপি তো একই কাজ করে। সেও তো আওয়ামী লীগকে একেবারে নিঃশেষ করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। দু'জন প্রথম সারির নেতাকে বক্তৃতামঞ্চে হত্যা করেছে, শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চেয়েছে। আবার বিএনপি'র সাথে মৌলবাদী শক্তিগুলো জড়িত। এরাসহ বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে দেশের পরিস্থিতি কী হতে পারে? তাই মন্দের ভাল হিসেবে আওয়ামী লীগই ভরসা। আওয়ামী লীগের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা এই ধরনের তর্ক তুলছেন। আওয়ামী লীগ খুব ভাল দেশ চালাচ্ছে, সেকথা বলার কোন উপায়ই যেহেতু নেই, সেহেতু সরকারের যৌক্তিকতা কিভাবে তুলে ধরা যায় নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই বাক্যগুলো রচনা করতে মাথার সমস্ত বুদ্ধি খাটাচ্ছেন এই বুদ্ধিজীবীরা।

### নির্বাচন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে

গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সরকারের পতনের সম্ভাবনা এই মুহূর্তে নেই। কারণ কোন একটা নেতৃত্ব আন্দোলনের উপর ক্রিয়া করছে না। সংগঠিত আন্দোলন এখনও সে মাত্রা নিয়ে গড়ে উঠেনি। কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটা বড় গোলযোগ দানা বেঁধে উঠতে পারে। নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেভাবে সম্ভব হয়েছে, জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা হবে না বলে অনেকে মনে করেন। কারণ স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকার কয়েকটি *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

# বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে

বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধানের তুলনামূলক চুলচেরা বিচারে, প্রচুর ফারাক থাকা সত্ত্বেও সকল দেশেই বুর্জোয়ারা এটা সাধারণভাবে মেনে নিয়েছিল যে তাদের সংবিধানের 'মূল কাঠামো' সব অবস্থাতেই অলংঘনীয় ও অপরিবর্তনীয়। আর এ অভিমতের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তারা একদিন বলেছিল,"পার্লামেন্ট সংবিধানের যে-কোন অংশের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে, তবে সেটা একটা বিধিনিষেধ মেনে নিয়েই করতে পারে, আর তা হল, পার্লামেন্ট কখনো কোন অবস্থাতেই সংবিধানের 'মূল কাঠামো'তে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে না।" এ প্রসঙ্গে কিছুটা পুনরাবৃত্তি হলেও, বুর্জোয়াদের সংবিধানে তাদেরই স্বীকৃত 'মূল কাঠামো'র একটি বিশেষ অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধানে তুলনামূলক বিশদ বিচারে বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সব দেশেই বুর্জোয়ারা–অবশ্যই তাদের চিন্তাধারার ভিত্তি অনুযায়ী, কয়েকটি মানবিক 'অধিকার'কে অলংঘনীয় বলে মনে করেছে। কোথাও তারা এক মৌলিক মানবিক অধিকার (fundamental rights) বলে বর্ণনা করেছে, আবার কোথাও হয়ত তাকে 'অধিকার সনদ' (বলে অভিহিত করেছে। তারা এ মানবিক অধিকারগুলোকে (human rights) তাদের সংবিধানের 'মূল কাঠামো'র অন্তর্গত হিসাবে অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয় বলেই শুধু মনে করেনি, পাছে কোথাও এই অধিকারের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ঘটে এই আশঙ্কায় এক রক্ষণাবেক্ষণের যথাযথ অধিকার ও দায়িত্ব তারা বিচার বিভাগের হাতে অর্পণ করেছে।

এই কারণেই বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে যে, একদিন বুর্জোয়ারা যে অধিকারগুলোকে অলংঘনীয় বলে মনে করতো, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী জগতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আজ সেই অধিকারগুলোই তার প্রথম বলিতে পরিণত হচ্ছে।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঊষালগ্নে বুর্জোয়ারা তাদের গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে, তাদের লিখিত বা অলিখিত যাই হোক না কেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কতকগুলো মানবিক অধিকার যেমন চিন্তার স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সাম্য, নাগরিক মাত্রের সমান সুযোগ, ধর্মের প্রতি আস্থা-অনাস্থার সমান অধিকার, ইত্যাদির স্বীকৃতি দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই মানবিক অধিকারগুলোকে তাদের সংবিধানের অপরিবর্তনীয় 'মূল কাঠামো'র অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা–তাদের যুক্তিতে এর একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো, কতকগুলো মানবিক অধিকার, যেমন, জীবন ধারণের অধিকার (Right to life) ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের অধিকার ইত্যাদিকে প্রশাসন বা অন্যান্য রাষ্ট্রযন্ত্রের হস্তক্ষেপের আওতার বাইরে এনে তাকে আইনগত বিধি নিয়মের (Legal principle) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করা, যার ফলে এগুলো একমাত্র বিচারবিভাড়েগর তত্ত্বাবধানের বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে পারে। বুর্জোয়ারা তখন এমন উক্তিও করেছিল যে এমনকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত পার্লামেন্টকেও সকল সময় মানবিক অধিকারের নিরাপদ রক্ষক মনে না করার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। আর পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ ও প্রশাসনের আগ্রাসনের বিপদকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই এই মানবিক অধিকারগুলো রচিত হয়েছিল। বুর্জোয়ারা তখন এই মানবিক অধিকারগুলোকে অলংঘনীয় বলেই মনে করত। একজন বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো,"...We all believe and that is the implication of fundamental rights that man has certain rights that are inalienable and cannot be questioned by any humanily constituted legislative authority..." অর্থাৎ আমরা সবাই বিশ্বাস করি এবং মানবিক অধিকারের তাৎপর্যই হল এই–মানুষের কতকগুলো অধিকার আছে যা অলংঘনীয়, এবং মনুষ্য সৃষ্ট কোন আইন-সংসদের তা নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার নেই।

অপর একজন এ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন,"Nothing is then unchangeable but the inherent and inalienable rights of man." (Jefferson) অর্থাৎ জন্মগত, এবং যা অলংঘনীয় এমন মানবিক অধিকারগুলো ছাড়া আর কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। এই অধিকারগুলোকে সংবিধানের অন্তর্গত করার স্বপক্ষে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল তা হল,"If they are incorporated into the constitution, independent tribunals of justice will consider themselves in a peculiar manner, the guardians of those rights; they (The Court) will be an impenetrable bulwark against every assumption of power in the Legislative or Executive, They will be naturally led to resist every enroachment upon rights expressly stipulated for in the constitution by the declaration of rights." (James Madison) অর্থাৎ এই অধিকারগুলো যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে স্বাধীর বিচারালয় নিজেদের বিশেষভাবে ঐ অধিকারগুলোর অভিভাবক হিসাবে বিবেচনা করবে, এরা (আদালতসমূহ) বিধান সংসদ (Legislative) অথবা প্রশাসন কর্তৃক দখল করা সমস্ত ক্ষমতার দুর্ভেদ্য প্রাকারে পরিণত হবে, এবং স্বভাবতই যে অধিকারগুলো সাংবিধানিক ঘোষণার দ্বারা চূড়ান্ত শর্ত হিসাবে গৃহীত, তার সীমা লঙ্ঘনের সকল প্রচেষ্টাকেই বাধা দেবে।

যে সকল দেশে এই মানবিক অধিকারগুলো, 'অধিকার সনদ' হিসাবে স্বীকৃত, সে সকল দেশেও এ অধিকারগুলোকে লিখিত ধারা হিসাবে সংবিধানের অন্তগর্ত করার স্বপক্ষে এ অভিমতই পোষণ করা হয়েছিল যে, "It must be conceded that there are such rights in every free government beyond the control of the state. A government which recognises no such rights, which held the lives, the liberty and the property of its citizen subject as all times to the absolute disposition and unlimited control of even the most democratic depository of power is after all but a despotism. It is a despotism of the majority, if you choose to call it so. But it is nonethless despotism." (Justice miller)

আবার জাস্টিস জ্যাকসনের বক্তব্য হল,"The very purpose of a Bill of rights of was to withdraw certain subjects from the vicissitudes of political controversy, to place them beyond the rich of majorities ... and to establish them as legal principles to be applied by the courts. One's right to life, liberty and property to free speech, a free press, freedom of worship and assembly and other fundamental rights may not be submitted to to the vote, they depend on the outcome of no election." অর্থাৎ এটা অনস্বীকার্য যে, 'মুক্ত' শাসনতন্ত্রে, রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এমন কতকগুলো অধিকার আছে। যে শাসনতন্ত্র এ অধিকারকে স্বীকার করে না এবং নাগরিকদের জীবন, সাহিত্য ও সম্পত্তিকে, সর্বসময়, এমনকি সর্বাধিক গণতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতারও সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার অধীনে আবদ্ধ রাখে, সে স্বৈরতন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এটা ঠিক, একে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্র যদি কেউ বলতে চায় তো বলতে পারে, কিন্তু এটা স্বৈরতন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। বিচারপতি জ্যাকসন-এর মত হল,'অধিকার সনদের' যথার্থ উদ্দেশ্যই হল রাজনৈতিক বিরোধ তথা উত্থান-পতনের গণ্ডির থেকে কতকগুলো বিষয়কে সরিয়ে নিয়ে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের নাগালের বাইরে রাখা ... এবং তাদের বিচারবিভাগের প্রয়োগাধীন আইনগত নিয়মবিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তির জীবনধারণের অধিকার, তার স্বাধীনতা, সম্পত্তি বা তার বাক-স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাসের অধিকার, সভা-সমাবেশ করার বা অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলোকে ভোটাভুটির আওতায় রাখা যেতে পারে না। এগুলো নির্বাচনী ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না।

কোন এক সময় Dean Roscoe Pound মন্তব্য করেছিলেন,"The guarantees of liberty ... are not ... exhortions as to how Government should be carried on or its agencies will operate.They are percepts of the law of the land backed by the power of the courts of law to to refuse to give effect to legislative or executive acts in derogation thereof ...Any considerable infringement of guaranted individual or minority rights appears to involve much more than overriding a pronouncement of political ethics in a political instrument. It involves defiance of fundamental law, overthrow of established law upon which the maintenance of the general security rests." অর্থাৎ, সরকার বা সরকারি যন্ত্র কীভাবে শাসনকার্য চালাবে, স্বীকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা বা মানবিক অধিকারগুলো তার অনুরোধলিপি নয়। এগুলো দেশের আইন স্বীকৃত নীতিবিশেষ এবং বিধান সংসদ বা প্রশাসনের এদের বিরুদ্ধে কোন হানিকর প্রচেষ্টাকে কার্যে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে, বিচারালয়ের বাধাদানের আইনসম্মত ক্ষমতার দ্বারা এ অধিকারগুলো সমর্থিত। এদের বিন্দুমাত্র খর্ব করাটা যে-কোন রাজনৈতিক যন্ত্রের ঘোষিত কোন রাজনৈতিক নীতিকে অগ্রাহ্য করার চাইতেও মারাত্মক। এ কাজ মৌলিক নীতিকে পদদলিত করা ও সর্বসাধারণের নিরাপত্তা যাকে অবলম্বন করে রয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠিত আইনকে ভূপতিত করার সামিল।

আর এই লক্ষ্যবস্তুকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়ারা ঘোষণা করেছিল যে, যদি কোন আইন মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ রকম কোন আইনকে বাতিল ঘোষণা করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বিচার বিভাগের হাতে থাকবে। যে সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিকভারেব লিখিত কোন সংবিধান ছিল না এবং সে কারণে স্বাভাবিকভাবে মৌলিক অধিকারের ওপর তাদের কোন লিখিত সাংবিধানিক ধারা (Constitutional Code) ছিল না। সকল রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকারগুলো দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা ( Common law of the land) স্বীকৃত, বিচার বিভাগের মতামতের দ্বারা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও 'হেবিয়াস করপাস' আইনের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে সমর্থিত ও প্রসারিত ছিল , এবং সে অর্থে এ অধিকারগুলোকে সে দেশের বুর্জোয়ারা তাদের সংবিধানের (অলিখিত) অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গণ্য করত। একসময় বুর্জোয়াদের জগতে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে,"The habeas Corpus Acts declare no principle and define no rights but they for practical purpose worth a hundred constitutional articles guaranteeing industrial liberty." (Dicey) অর্থাৎ হেবিয়াস করপাস আইন কোন নীতি ঘোষণা করে না, বা কোন অধিকারের সংজ্ঞাও নিরূপণ করে না, কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় হিসেবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ আইন, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে এমন একশত (লিখিত) সাংবিধানিক ধারার চাইতেও বেশি মূল্যবান।

কোন একটি প্রখ্যাত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বুর্জোয়ারা তাদের সংবিধান রচনাকালে প্রস্তাবনা হিসেবে ঘোষণা করেছিল যে,"Men are born and always continue, free and equal in respect of their rights. The end of all political associations is the presentation of the natural and unprescriptible rights of man, and these rights are liberty, property, security and resistance of oppression." অর্থাৎ অধিকারের প্রশ্নে সব মানুষ তার জন্ম থেকেই সর্বদা স্বাধীন ও সমান। সমস্ত রাজনৈতিক সমিতির লক্ষ্যই হল এই সহজাত, এবং অধ্যাদেশযোগ্য নয় (nprescriptible) এমন মানবিক অধিকারগুলোকে রক্ষা করা, আর এই অধিকার গুলো হল স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তার অধিকার এবং অত্যাচারকে প্রতিরোধের অধিকার। এখন, যেহেতু সাংবিধানিক প্রস্তাব আইনগত বাধ্যতার পর্যায়ে পড়ে না, বুর্জোয়ারা সে কারণে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তাদের সংবিধানে উপযুক্ত ধারা সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল এবং যেহেতু ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর সরকারি কুঠারাঘাতের অন্যতম নগ্ন প্রকাশ ঘটত অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার ও আটক করার মধ্য দিয়ে, সে কারণে অন্যান্য ধারার সঙ্গে তারা একটি ধারা যুক্ত করল–যার বয়ান অনুসারে," No one may be arbitrarily detained. The judicial authority, the guardian of individual liberty shall ensure the respect of this principle under the conditions stipulated by law.Ó অর্থাৎ কিনা, কাউকে খেয়ালখুশি মাফিক যথেচ্ছভাবে আটক করে রাখা চলবে না। ব্যক্তিস্বাধীনতার অভিভাবক তথা রক্ষক, বিচার বিভাগ, আইনের শর্তানুসারে এ নীতি যাতে মানা হয় সেটা নিশ্চিত করবে। ইতিহাসের এটা এমন একটা যুগ যখন বুর্জোয়ারা দ্বিধাহীন ভাষায় বলতো,"... Constitutional liberties – freedom of the person and of association, equality before the law and liberty of expression – precede and are the conditions of economic advance and social security – both of which are largely the result of constitutional freedom and cannot be obtained without them. That is why those who throw away constitutional safeguards – elected governments, freedom to oppose, independent courts – in the name of economic advance *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

# গার্মেন্টস শ্রমিকদের ৮০০০ টাকা মজুরি প্রত্যাখ্যান, ১৬০০০ টাকা মজুরি দাবি

'প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবনা ৮০০০ টাকা মানি না এবং অবিলম্বে মজুরি ১৬,০০০ টাকা কার্যকর করতে হবে' – এই দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের উদ্যোগে ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর ৮,০০০ টাকার মজুরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ১২টি সংগঠনের জোট 'গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলন' ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী সে আবেদনে সাড়া না দিয়ে মালিকদের পক্ষ নিলেন। বেসিক ১০,০০০ টাকাসহ মোট নিম্নতম মজুরি ১৬,০০০ টাকার পক্ষে যুক্তি-তর্ক এবং সেগুলোর সপক্ষে গবেষণাও হাজির করা হয়েছিল। সে-অনুযায়ী শ্রমিক কনভেনশনও হয়েছিল। অথচ এখন জোটের প্রস্তাব, অন্যান্য বেশিরভাগ শ্রমিক সংগঠনের প্রস্তাব এবং সিপিডির প্রস্তাবসহ কারও প্রস্তাবকেই মজুরি ঘোষণায় আমলে নেয়া হলো না।

গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের বর্তমান সমন্বয়কারী এড. মাহবুবুর রহমান ইসমাইল-এর সভাপতিত্বে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু, গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সাধারণ সম্পাদক জুলহাসনাইন বাবু, ওএসকে গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মোঃ ইয়াসিন, গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের সভাপতি শবনম হাফিজ, বিপ্লবী গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন মোশতাক, গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক বিপ্লব ভট্টাচার্য এবং বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি অরবিন্দ ব্যাপারী বিন্দু প্রমুখ।

# সাতক্ষীরায় গ্রেপ্তারকৃত বাসদ (মার্কসবাদী) নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ২১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে সাতক্ষীরায় বাম গণতান্ত্রিক জোটের জেলা নির্বাচন অফিস ঘেরাও কর্মসূচি থেকে গ্রেপ্তারকৃত বাসদ(মার্কসবাদী) জেলা কমিটির সদস্য এড. খগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অধ্যাপক প্রশান্ত রায় এবং বাসদ জেলা সমন্বয়ক নিত্যানন্দ সরকারের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন। উল্লেখ্য, গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দকে থানা হাজত থেকে জেলা জজ কোর্টের জিআরও-র মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) ও ২৫(ঘ) ধারায় 'পরিকল্পিতভাবে নাশকতামূলক কার্যকলাপ সংঘটনের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া অপরাধের প্রস্তুতি গ্রহণ ও ষড়যন্ত্রের অপরাধ'-এর অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের নিপীড়নমূলক স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের নমুনা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি থেকে এই গ্রেপ্তার ও মিথ্যা অভিযোগে জেলে প্রেরণ। মামলার এজাহারে একদিকে বলা হয়েছে তারা বিএনপি-র 'উচ্ছৃঙ্খল' নেতাকর্মী, খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে অরাজকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমবেত হয়েছিল, অন্যদিকে বলা হয়েছে তাদের হাতে বাম গণতান্ত্রিক জোট লেখা ব্যানার ও হ্যাণ্ডবিল পাওয়া গেছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে খগেন্দ্রনাথ ঘোষ সাতক্ষীরা জজকোর্টে প্র্যাকটিসরত আইনজীবী, প্রশান্ত রায় তালা কুমিরা মহিলা কলেজে

শিক্ষকতারত সহকারী অধ্যাপক এবং নিত্যানন্দ সরকার একটি কলেজে বিজ্ঞানের ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে কর্মরত। কোনো ধরণের অভিযোগ ছাড়াই শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের এই তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলায় জড়ানোর ঘটনা রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি মহাজোট সরকারের অসহিষ্ণুতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার আরেকটি নিদর্শন। দলীয়করণকৃত পুলিশ প্রশাসন সরকারবিরোধীদের ফাঁসাতে কিভাবে ভুয়া ও ভিত্তিহীন মামলা সাজায় তার উদাহরণ তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ। হামলা ও মামলায় হয়রানি করে সরকার বামপন্থীদের ভয় দেখাতে চায় যাতে তারা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন থেকে সরে আসে। কিন্তু নির্যাতন-গ্রেপ্তার, দমন-পীড়ন মোকাবেলা করে বাম গণতান্ত্রিক জোট আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবিচল থাকবে।"

# 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবতা' শীর্ষক মুক্ত সংলাপ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবতা' শীর্ষক মুক্ত সংলাপ ২৭ জুলাই বিকেল ৩টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অরূপ দাস শ্যাম, আলোচনা করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, স্টেট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মামুন আল রশীদ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা ও সমাজকর্ম বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক শহীদ মল্লিক ও ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার, অভিমিতা স্বর্ণা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র ও অনিয়ম-দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, "শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ নীতির কারণে দিনদিন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য কমে আসছে। ফলে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাকে না দেখে পুরো শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যার সাথে তাকে মিলিয়ে দেখতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে হবে।" তিনি আরো বলেন, "বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিতে বাজারের জন্য কেতাদুরস্ত কেরানী তৈরি হতে পারে কিন্তু মানবিক মানুষের সমাজ কখনো তৈরি হতে পারে না।" প্রভাষক শহীদ মল্লিক বলেন, "বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজারের প্রয়োজন এমন বিষয়গুলোকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। মানবিক মানুষ গড়ে তোলার কোনো আয়োজন সেখানে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধু ছাত্র-ছাত্রীদেরই নয়, শিক্ষকদেরও নেই মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও শিক্ষকদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের ইচ্ছে মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।" রাশেদ শাহরিয়ার বলেন, "শিক্ষার কৃত্রিম সংকট তৈরি করে শাসকগোষ্ঠী আমাদের দেশে শিক্ষার বেসরকারিকরণকে বৈধতা দিতে ১০৩ টি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দিয়েছে, যার সংখ্যা সামনে আরো বাড়বে। শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষানীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গি একে অন্যের পরিপূরক, যার মূল উদ্দেশ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার অধিকার হরণ করা। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই।"

## নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে নারী মুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ৩০ আগস্ট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

# গ্রেফতারকৃত শিক্ষার্থী ও আলোকচিত্রী শহিদুল আলমের মুক্তি দাবি

নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ও কোটা সংস্কার আন্দোলনে গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষার্থী এবং আলোকচিত্রী শহিদুল আলমের মুক্তির দাবিতে ১৮ আগস্ট বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোট ঢাকা মহানগরের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সাইফুল হক, সিপিবি ঢাকা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডা. সাজেদুল হক রুবেল, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের খালেকুজ্জামান লিপন, বাসদ (মার্কসবাদী) নগরের নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিক, গণসংহতি ঢাকা নগরের নেতা বাচ্চু ভুইয়া, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির নগর নেতা মোস্তাক আহমেদ প্রমুখ।

# শ্রম আইন সংশোধনী শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এবং শ্রমিকদের সাথে প্রতারণামূলক

সম্প্রতি মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদিত শ্রম (সংশোধনী) আইনকে সরকারের দাবি অনুযায়ী 'শ্রমিকবান্ধব' তো নয়ই, বরং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এবং শ্রমিকদের সাথে প্রতারণামূলক বলে অভিহিত করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে জহিরুল ইসলাম ও উজ্জ্বল রায় ১২ সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, "বিদ্যমান শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারাগুলো বাতিল করে একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের জন্য আমাদের সংগঠনসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে এসেছি। অথচ সরকার সে দাবি অনুসারে অগণতান্ত্রিক ধারাগুলো বাতিল তো করেইনি, বরং নতুন সংশোধনীকে কৌশলপূর্ণ চাতুর্যের সাথে 'অধিক শ্রমিকবান্ধব' হিসেবে দেখিয়ে তার আড়ালে শ্রমিক অধিকার হরণের সমস্ত আয়োজন ও বিধিবিধান অক্ষুণ্ন রেখেছে।"

বিবৃতিতে বলা হয় – "পূর্বের ৩০% শ্রমিকের স্থলে বর্তমানে ২০% শ্রমিকের সম্মতিতে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে - এ সংশোধনীর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে আরো সহজ করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। অথচ এ ধরণের শর্ত আরোপ সরকারস্বীকৃত আইএলও সনদের ৮৭ ও ৯৮ ধারার (সংঘবদ্ধ হওয়া,স্বাধীনভাবে সংগঠন করা ও নেতা নির্বাচনের অধিকার) পরিপন্থী। আই এলও কনভেনশনে আছে, ১০ জন শ্রমিকও ট্রেড ইউনিয়ন করতে চাইলে তাদের অনুমতি দিতে হবে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ৭ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা যায়। শ্রম আইনের ২৩, ২৬, ১৮০ ধারা বহাল রেখে কার্যত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন অসম্ভব করা হয়েছে। ২৩, ২৬ ধারা ব্যবহার করে মালিক শ্রমিককে ইচ্ছেমতো ছাঁটাই করতে পারে। ১৭৯, ১৮০এর মতো কালো ধারাও বহাল আছে, যাতে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংকুচিত করা হয়েছে।"

বিবৃতিতে আরো বলা হয় – "কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের মৃত্যুতে ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারের প্রতি চরম উপহাসের সামিল। এ প্রস্তাব আইএলও কনভেনশনের ১২১ ধারার আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণের বিধান এবং রানা প্লাজা ধ্বসের পর হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত কমিটির ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের সুপারিশের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাসের প্রস্তাব বৈষম্যমূলক। কারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত/সরকারি প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস চালু আছে। পূর্বে শ্রমিক সরাসরি শ্রম আদালতে মামলা করতে পারতো। এখন শ্রম আইনের সংশোধনীতে মামলা করার জন্য কলকারখানা পরিদর্শক অধিদপ্তরের অনুমতি নেয়ার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এ অনুমতি নিতে গিয়ে শ্রমিক দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হবে। এছাড়া, 'খাবার এবং বিশ্রাম ছাড়া টানা ১০ ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাবে না' – এ কথা বলে শ্রমিকের কর্মদিবস ১০ ঘন্টা নির্ধারণ করে রক্তস্নাত ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো। ফলে শ্রম আইন(সংশোধনী) ২০১৮ এর মাধ্যমে সরকার মালিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী হিসেবে তার অতীতের বিশ্বস্ত ভূমিকাই পালন করেছে।"

নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে এ অগণতান্ত্রিক শ্রম(সংশোধনী) আইন অবিলম্বে বাতিল করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের জোর দাবি জানান এবং এ লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুলতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানান।

# পূর্ণাতি ত্রিপুরা ধর্ষণ-হত্যার বিচার দাবীতে খাগড়াছড়িতে মানববন্ধন

খাগড়াছড়িতে পূর্ণাতি ত্রিপুরার ধর্ষক ও খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবীতে শিশু কিশোর মেলা ৩১ জুলাই সকালে খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে। ২৯ জুলাই দিঘীনালার নয়মাইল এলাকায় ৫ম শ্রেণির ছাত্রী পূর্ণাতি ত্রিপুরা ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়। মানববন্ধনে উজ্জ্বল মারমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নেতা কবির হোসেন, শিশু কিশোর মেলার সংগঠক স্বাগতম চাকমা, কৃষ্টি চাকমা, মিলন কান্তি ত্রিপুরা, ৮ম শ্রেণির ছাত্র কাঁকন চাকমা। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, পাহাড় ও সমতলে প্রতিদিন শিশু ও নারী হত্যা-ধর্ষণ-গুম বেড়েই চলেছে। কিন্তু এর কোনো বিচার নেই। সরকার নাগরিকের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পূর্ণাতি ত্রিপুরাও এর শিকার। ধর্ষক ও হত্যাকারী যেই হোক না কেন এর বিচার করতে হবে। যেভাবে দেশে অপসংস্কৃতি বেড়েই চলেছে এটি তারই ফল। অপসংস্কৃতি রুখতে সরকার থেকে কোনো উদ্যোগ নেই। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে, শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। বক্তারা দাবী করেন পূর্ণাতি ত্রিপুরার ধর্ষক ও হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও ফাঁসি দিতে হবে এবং নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা দিতে হবে।

# বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে

*(৩য় পৃষ্ঠার পর)* are ultimately betraying the common man and depriving him of the chance of social progress and the very things they promise him...They are the real class traitors – because in the end they impose themselves as masters of those before him whom they parade themselves as liberators." (Hailsham) অর্থাৎ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সভা-সমিতি সংগঠিত করার স্বাধীনতা, আইনের চোখে সকলের সাম্য ও বাকস্বাধীনতা - সংবিধান প্রদত্ত এই স্বাধীনতার অধিকারগুলো অর্থনৈতিক উন্নতির শর্ত ও সামাজিক নিরাপত্তার শর্ত এবং তার পূর্বসূরী - আর এ দুটি বিষয়ই অনেকাংশে সংবিধান প্রদত্ত স্বাধীনতার ফলশ্রুতি এবং এ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব নয়। সে কারণে যারা অর্থনৈতিক প্রগতির নামে নির্বাচিত সরকার, বিরোধীমত প্রকাশ করার স্বাধীনতা ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা - এই জাতীয় সংবিধানগত রক্ষাকবচগুলিকে বর্জন করে, তারা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সামাজিক প্রগতি ও অন্যান্য যে সকল বিষয়ে তারা সাধারণ মানুষের কাছে অঙ্গিকারবদ্ধ, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে। এরাই যথার্থ শ্রেণীশত্রু - কারণ যাদের কাছে এরা নিজেদেরকে মুক্তিদাতা হিসাবে জাহির করে, পরিণামে এরা সেই তাদেরই প্রভু হয়ে বসে।

**উন্নত বা অনুন্নত সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই বিশেষ করে তাদের রাষ্ট্র কাঠামোয় আজ বিভিন্নরূপে ফ্যাসিবাদের প্রকাশ ঘটছে**

এখন, ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঊষাকাল চিরকাল টিকে থাকেনি এবং থাকা সম্ভবও নয়। অতিদ্রুত ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করেই, সামাজিক বিকাশের এক বিশেষ স্তরে এসে প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও লগ্নিপুঁজির জন্ম দিল। আজকের যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তানায়ক, আমাদের প্রিয় শিক্ষক ও নেতা, কমরেড শিবদাস ঘোষ অপূর্ব বিশ্লেষণসহ দেখিয়েছেন আজকের যুগে কীভাবেএকচেটিয়া পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই তৃতীয় তীব্র সাধারণ সংকটের যুগে বুর্জোয়ারা, তাদের সংকট জর্জরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা ও তার থেকেই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করার উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্র পুঁজি ও একচেটিয়া ব্যক্তিপুঁজির সমন্বয় সাধন ও রাষ্ট্রকে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী গোলামে পর্যবসিত করে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ - যেটা ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিপ্রস্তর, তার জন্ম দিচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখন ফ্যাসিবাদের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে উপরোক্ত অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন এরই প্রকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক শক্তির নিরঙ্কুশ কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে। এটা বিশেষ বিচার্য বিষয় নয় যে ফ্যাসিস্টরা ঠিক কোন বিশেষ ধরনের সরকার বা শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে দেশকে শাসন করে, কারণ তা দেশের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যে বিশেষ ধরনের সরকার বা শাসনযন্ত্রই প্রতিষ্ঠা হোক না কেন, উদ্দেশ্য সর্বক্ষেত্রেই এক, অর্থাৎ কিনা, বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকটের যুগে নিজেদের সঙ্কট জর্জরিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, এককথায় তাকে টিকিয়ে রাখা। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয়তম শিক্ষক ও নেতা, কমরেড শিবদাস ঘোষ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা স্মরণীয়। কমরেড ঘোষ বলেছেন যে, সমস্ত অগ্রসর ও অনগ্রসর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্রেই, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, বিভিন্ন রূপে, পূর্বের চাইতে অনেক বেশি লক্ষণীয়ভাবে আজ ফ্যাসিবাদের প্রকাশ ঘটছে।

সুতরাং ফ্যাসিবাদ ইতিহাসে তার প্রথম আবির্ভাবকালে ইতালি ও জার্মানিতে যে একদলীয় স্বেচ্ছাচারী শাসনের (one party totalitarian rule) রূপ নিয়েছিল, আজও সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই সেই রূপই যে তাকে নিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আর সে কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্যাসিবাদ আজ বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শাসনতন্ত্র তথা প্রশাসনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে ও সংহত রূপ নিচ্ছে। কোথাও হয়ত প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রিক ওয়েস্ট মিনিস্টার ধরনের সরকার (West Minister form of government) সহ তথাকথিত দ্বিদলীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে, যদিও এই দুটি দলই একচেটিয়া পুঁজিবাদের বশংবদ ও নির্ভরশীল দলই হয়ে থাকে। আবার যেখানে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে শাসনযন্ত্রের সেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি দখল করে আছেন রাষ্ট্রপতি, সেখানে তার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ঘটছে। অনগ্রসর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে, যেখানে পুঁজিবাদের উচ্চ পর্যায়ের বিকাশ না ঘটায় ও পুঁজির অসম বিকাশের ফলে পুঁজিপতিরা স্থানীয় (regional) ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আছে, সে সকল রাষ্ট্রে তথাকথিত বহুদলীয় গণতন্ত্রের (সঁষঃু ঢ়ধৎঃু ফবসড়পৎধপু) মাধ্যমেই ফ্যাসিবাদের বিকাশ ঘটছে। বলাই বাহুল্য যে, এই তথাকথিত বহুদলীয় গণতন্ত্র আর পুঁজিবাদের বিকাশের যুগের বহুদলীয় গণতন্ত্র মোটেই এক নয়।

সুতরাং রাষ্ট্র তথা শাসনযন্ত্রের অবয়বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, আজকের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রকাঠামো ও শাসনযন্ত্র মাত্রই ফ্যাসিবাদী শাসনের প্রতিলিপি ছাড়া আর কিছু নয়।

*[লেখাটি ভারতের এসইউসিআই (সি) প্রকাশিত বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে পুস্তিকা থেকে অংশবিশেষ সংকলিত]*

# গোবিন্দপুরে চাষীদের আন্দোলনে দাবি আদায়

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নে ফসলের মাঠে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে কৃষকদের আন্দোলন বিজয়ী হয়েছে। এলাকার প্রভাবশালীরা ১১টি বিল থেকে পানি নিষ্কাশনের খালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে সেখানে নানা ধরণের স্থাপনা করেছে। ফলে বর্ষাকালে ওইসব খাল দিয়ে পানি নিচে নামতে পারে না। বেশ কয়েকবছর ধরে বিল ও খালগুলো ভরাট করে জমি, দোকানপাট ও বসতবাড়ি নির্মাণ করায় ফসলি জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে এলাকার কৃষকরা চরম ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। অবৈধ দখলদারদের কবল থেকে খাল-নালা উদ্ধারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ-এর দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গড়ে ওঠে 'গোবিন্দপুর ফসল মাঠ জলাবদ্ধতা নিরসন সংগ্রাম কমিটি'। এই কমিটির আহ্বায়ক বাসদ(মার্কসবাদী) নেতা আলাল মিয়া।

সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে গোবিন্দপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার ফসলের মাঠের জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে গত ১৪ আগস্ট বিক্ষোভ মিছিল এবং পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দেয়া হয়। সংগ্রাম কমিটির ব্যানারে উপজেলার হোসেনপুর-নান্দাইল আঞ্চলিক সড়কের গোবিন্দপুর চৌরাস্তার পাশে এই কর্মসূচিতে সহস্রাধিক কৃষক অংশ নেন।

৩০ আগস্ট গোবিন্দপুর বাজারে মানববন্ধন কর্মসূচি ও সানকি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এসময় শত শত কৃষক মাটির তৈরি খাবারের সানকি হাতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন। এসময় বক্তৃতা করেন সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আলাল মিয়া, সদস্যসচিব আবুল কাশেম, যুগ্ম সচিব কৃষক জালাল মিয়া, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মতিন, সোহরাব ব্যাপারী, জমির বেপারী, গোলাপ মিয়া। এই কর্মসূচি থেকে ঘোষণা দেয়া হয় – অবিলম্বে প্রশাসন খাল-নালা দখলমুক্ত করার উদ্যোগ না নিলে ৫ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক অফিস ঘেরাও ও স্মারকলিপি পেশ করা হবে। এর আগেই ইউএনও-র উদ্যোগে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বাররা জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল-নালা উদ্ধারের কাজ শুরু করেন। ১১টির মধ্যে ইতিমধ্যে ৮টি বিল জলাবদ্ধতামুক্ত হয়েছে। আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করলেও সংগ্রাম কমিটি ঘরোয়া সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। খাল সংরক্ষণে পাড় ইট দিয়ে বাঁধাই করে দেয়াসহ জলাবদ্ধতা নিরসনে স্থায়ী ব্যবস্থার দাবিতে তারা ভবিষ্যতে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, হোসেনপুরের গোবিন্দপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা কয়েক বছর ধরে মাঠে ফসল উৎপাদন করতে পারছেন না। অথচ আগে কৃষকরা এসব মাঠে ধান, বাদাম, আলু, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, রসুন এসব ফসল উৎপাদন করতেন। কিন্তু ২০০৮ সালের পর থেকে ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ফসলের মাঠ থেকে পানি নিষ্কাশনের খাল আর নালাগুলো প্রভাবশালী বিভিন্ন মহল দখল ও বন্ধ করে দিতে থাকে। ফলে ওই এলাকার তারা বিল, কামিনী বাবুর বিল, বলিয়ার বিল, হারুয়ার বিল, হিংড়া হুলির বিল, উত্তরের বিল, দক্ষিণের বিল, গোপাল নদীর নাল, কাট গড়িয়া বিল, কোমার গাথা বিল ও জালু পুরির বিলসহ আরো কয়েকটি ফসলি মাঠের পানি নিষ্কাশনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন ফসলের মাঠে ফসল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি এলাকার শতাধিক বাড়িতে বছরজুড়ে জলাবদ্ধতা থাকে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, পানি নিষ্কাশনের এসব খাল বা নালা জনগণের সম্পদ। কিন্তু এলাকার সুবিধাবাদী মহল এসব খাল-নালা দখল করে নিজের প্রয়োজনে মাটি ভরাট করে বাড়িঘর, দোকান তৈরি করছে। ফলে এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে তিন ফসলি জমি এক ফসলিতে পরিণত হয়েছে। প্রায় ৪০-৫০ হাজার মণ ধান উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা। এতে ফসল ফলাতে না পেরে সংসার চালাতে অনেক চাষীকে ঋণ করতে হচ্ছে। পরে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে অনেকে জমিজমা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

# চারণের উদ্যোগে 'উত্তরাধিকার রবীন্দ্র-নজরুল'

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে ২৮ জুলাই শনিবার দুপুর ৩টায় 'উত্তরাধিকার রবীন্দ্র-নজরুল' শীর্ষক অনুষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য সোমা।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, পুঁজিবাদ মানবসভ্যতার সকল মহৎ সৃষ্টিকে ধ্বংস করছে। তাই এ সমাজ ও মানবসভ্যতা রক্ষায় সমাজ বদলের বিকল্প নেই। রবীন্দ্র- নজরুল তাই আজকের দিনে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। এখনকার তরুণসমাজকে তাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে হলে মননে, চিন্তায় তাদেরকে ধারণ করতে হবে। তাদের গান, কবিতা ও নাটকের মর্মবাণী সমাজের প্রতিটি শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ সংকটময় সময়ে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। আজকের দিনে তাদের উত্তরাধিকার বহন করতে গেলে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা উপলব্ধি করতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের যথার্থ উত্তরাধিকার হওয়ার সংগ্রামে ব্রতী হতে হবে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে। চারণের এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সেই যাত্রার সূত্রপাত হল, যা দেশের সমস্ত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে। আলোচনাপর্ব শেষে ফেনী, ময়মনসিংহ, খুলনা ও ঢাকা জেলা চারণের শিল্পীরা গান, নৃত্য, আবৃত্তিতে রবীন্দ্র-নজরুলের সমাজ, প্রেম-প্রকৃতি ও দেশপ্রেম ভাবনা ফুটিয়ে তোলেন।

# ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

*(১ম পৃষ্ঠার পর)* জনগণকে ভয়ভীতি দেখায় এবং রাষ্ট্রের ক্ষতি করে, তাহলে ১৪ বছরের জেল ও এক কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

বিলের ২১ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রোপাগান্ডা ও প্রচার চালানো বা এতে মদদ প্রদান করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুরূপ কার্য হবে একটি অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি অনধিক ১০ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও এক কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এই ধারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে নিরুৎসাহিত করবে।

সংসদীয় কমিটির সুপারিশকৃত বিলের ২৫ ধারায় (ক) উপধারায় বলা হয়েছে, "যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এমন কোন তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোন তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা খ) রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ন করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা তদুদ্দেশ্যে অপপ্রচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।"এই অপরাধের শাস্তি অনধিক ৩ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন অপরাধের জন্য ৫ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

২৮ ধারায় ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করার বিধানে শাস্তি ৫ বছর করার সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২৯৫-২৯৮ ধারাগুলোর মধ্যেই ধর্মীয় অবমাননার শাস্তি কী হবে তা নির্ধারণ করা আছে। অথচ এই আইন থাকা সত্ত্বেও ডিজিটাল আইনে নতুন করে বিষয়টি সংযোজন করে নতুনভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে যখন যাকে খুশি শায়েস্তা করার জন্য এই আইনের অপব্যবহারের সুযোগ থেকেই যাচ্ছে।

বিলের ২৯ ধারায় কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করলে তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লাখ টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। মানহানির জন্য প্রচলিত আইন আছে। সুতরাং, ডিজিটাল মানহানির জন্য ডিজিটাল আইন কতটুকু প্রয়োজন? এই আইন পাশের ফলে একই অপরাধে দুই রকম শাস্তির ব্যবস্থাও তৈরি হচ্ছে।

এ আইনের ৩১ ধারা অনুযায়ী ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে অরাজকতা সৃষ্টি বা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে এমন তথ্য প্রচারের শাস্তি হিসেবে সাত বছরের জেল ও পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

বিলের ৩২ (১) ধারায় বলা হয়েছে, "যদি কোনো ব্যক্তি অফিশিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্টের আওতাভুক্ত অপরাধ কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংঘটন করেন বা করিতে সহায়তা করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হবেন। ৩২ (২) ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি উপধারা-১ এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুনঃ সংঘটন করেন, তাহা হইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।"

এ ধারা আইনটিতে থাকলে আমলা বা ক্ষমতাসীন দলের লোকজন ছাড়া অন্য যে কারো পক্ষে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার দফতরে ক্যামেরা, মোবাইল ফোন বা পেনড্রাইভের মতো ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার বিপদজ্জনক হয়ে পড়বে। এমন কি ওই সব দফতরের ই-মেইল বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কাউকে কোনো তথ্য বা নথির কপি পাঠানোও অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। এটা দুর্নীতিবাজ আমলা ও সরকারি দলের লোকজনদের সুরক্ষা দেবে। দুর্নীতি-দুষ্কৃতির কোনো তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ সংবাদকর্মীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নথি-তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করতে হলে হলমার্ক, ইউনিপে টু, ডেসটিনির লুটপাট, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরিসহ বিভিন্ন ব্যাংকের অর্থ কেলেংকারির কথা দেশের মানুষ হয়তো কখনোই জানতে পারতো না। সরকারি দলের বহু নেতা-এমপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, ক্ষমতার অপব্যহার, মাদক ব্যবসা, মানবপাচার ইত্যাদির যে কথা-কাহিনী মানুষ জানতে পেরেছে, তাও হয়তো তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হতো না। একজন মন্ত্রী তো রাখ ঢাক না করেই বলেছেন, 'আপনারা গণমাধ্যমে যেভাবে বিভিন্ন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন, তাতে তাদের মান-ইজ্জত থাকে না। তাদের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। তারা তো জনপ্রতিনিধি। এ আইনের বলে এখন হয়তো এমন পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।'

বিলের ৪৩ ধারায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে পুলিশ অফিসারকে পরোয়ানা ছাড়াই তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী শেষে বলেন, "এই সব অগণতান্ত্রিক বিধান মিলে এই আইনটি বাস্তবে একটি কালাকানুন বা নিবর্তনমূলক আইন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের কুখ্যাত ৫৭ ধারার মত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের উপরোল্লিখিত ধারাগুলো এই স্বৈরতান্ত্রিক আওয়ামী লীগ সরকার ভিন্নমত ও বিরোধী দমনের হাতিয়ার হিসেবে আগামীতে ব্যবহার করবে। সেজন্যই প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে সাংবাদিকসহ সকল মহলের মতামত সরকার অগ্রাহ্য করেছে। এই কালো আইনের বিরুদ্ধে চিন্তার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকলকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।"

## বাম গণতান্ত্রিক জোটের সচিবালয় ঘেরাওয়ে পুলিশি বাধা

*(১ম পৃষ্ঠার পর)* বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক সাইফুল হকের সভাপতিত্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভপূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম, বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, বাসদ (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিক, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক।

গত ৪৭ বছরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোনো সুযোগ নেই। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির মতো একতরফা নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষ মেনে নিবে না। একতরফা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকারের দুঃশাসনে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ। জোর করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সরকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। দমন-নিপীড়ন, হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার, রিমান্ডে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, অপহরণ, গুম-খুন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সাধারণ নিয়মে পরিণত করেছে। গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। বিরোধী দল ও মতকে গায়ের জোরে দমন করা হচ্ছে। দলীয়করণ, জবরদখল, ব্যাংক ডাকাতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সীমাহীন চুরি, লুটপাট, অর্থপাচার এক ভয়ানক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। মেগা প্রকল্পে মেগা দুর্নীতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিচারব্যবস্থার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব পূর্বের সকল সময়ের চেয়ে জোরদার করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকার্যকরী করে তোলা হয়েছে। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ ও ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সর্বশেষ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নামের কালো আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের দুর্নীতি-লুটপাট আড়াল করতে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাকস্বাধীনতা হরণ করতে এ আইন ব্যবহৃত হবে।

সমাবেশে সাতক্ষীরায় গ্রেফতারকৃত বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করা হয়।

## দৈনিক মজুরি ৩শ টাকা নির্ধারণের দাবিতে চা শ্রমিক ফেডারেশনের বিক্ষোভ

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ২৬ আগস্ট বিকাল ৪টায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চা শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হৃদেশ মুদির সভাপতিত্বে এবং অজিত রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলার সভাপতি সুশান্ত সিনহা সুমন, সন্তোষ বাড়াইক, লাংকাট লোহার, শেলী দাশ, বীরেন সিং প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ২০ আগস্ট ঈদের আগের দিন চা শ্রমিকদের জন্য সরকার মাত্র ১০২ টাকা মজুরি নির্ধারণ করে। বর্তমান বাজারে এক কেজি চালের দাম যেখানে ৫০ টাকা সেখানে এই অল্প মজুরি দিয়ে চা শ্রমিকদের জীবন চালানো অসম্ভব। অথচ চা শ্রমিকদের দীর্ঘ দিনের ৩শ টাকা মজুরির দাবি উপেক্ষা করে সরকার এই অন্যায্য মজুরি নির্ধারণ করেন। সমাবেশে দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে অবিলম্বে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩শ টাকা নির্ধারণের দাবি জানানো হয়।

## সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ষড়যন্ত্রে নিজ দেশে পরবাসী

*(শেষ পৃষ্ঠার পর)* কাগজপত্র থাকলেও দরিদ্র, হতদরিদ্র হওয়ায় আদালতে যেতে পারেনি পয়সার অভাবে।

এখন নতুন করে বিজেপি ও পারিষদ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থে রাজ্য সরকার হাতে নিয়েছে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি বা ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেনস(এনআরসি)। যেখানে উপযুক্ত সময় ও কাগজপত্র দাখিলের সুযোগ না পাওয়ায় অনেকেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। বেশির ভাগই শ্রমজীবী হতদরিদ্র, ফলে নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায় তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন সমস্ত কাগজ সময় মতো দাখিল করা। ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তারা বহু বছর ধরে বসবাস করছে, তাদের সন্তানরা সেখানেই জন্ম গ্রহণ করে স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করছে। প্রচলিত বিচাব্যবস্থায় রীতি হচ্ছে, যিনি অভিযোগ করবেন, তাকেই প্রমাণ করতে হবে অভিযোগের সত্যতা। অথচ আসামের ক্ষেত্রে উল্টো আইন চলছে। গেল প্রায় ৪০ বছর ধরে দফায় দফায় নাগরিকত্বের প্রমাণ দেখালেও নতুন নতুন কৌশলে সমস্যা জিইয়ে রাখা হচ্ছে। অনেকটা নির্বাচনী ট্রাম্পকার্ডের মতো যখন প্রয়োজন তখন বাংলাদেশী খেদাও আন্দোলনকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে।

ভারতের 'সোশ্যালিস্ট সেন্টার অব ইণ্ডিয়া(কমিউনিস্ট)' বা এসইউসিআই(সি) দলের বাংলা মুখপত্র সাপ্তাহিক গণদাবী পত্রিকার ৫ -১১ অক্টোবর, ২০১৮ সংখ্যায় লেখা হয়েছে – "বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, '২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচন জিতে সরকার গঠনের পরে আমরা দেশের প্রতিটি কোনা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের এক এক করে খুঁজে বের করব এবং বিতাড়ন করব।' ... ... প্রচারের জোরে বহু মানুষের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, 'অন্য রকমের দল' বলে দাবি করা বিজেপি ক্ষমতায় এলে সত্যিই হয়ত তাঁদের জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করবে। কিন্তু চার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বুঝে গেছেন, কংগ্রেসের মতো বিজেপিরও মানুষকে আরও মূল্যবৃদ্ধি, আরও বেকারি, আরও ছাঁটাই, আরও বেসরকারিকরণ, আরও দুর্নীতি ছাড়া দেওয়ার কিছু নেই। ... ... তাঁদের জনবিরোধী শাসনে সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি বেড়েই চলেছে। তার অনিবার্য পরিণতিতে মানুষের ক্ষোভও বাড়ছে। বিজেপি নেতারা খুব ভাল করে জানেন, মানুষের এই ক্ষোভ যে কোনও সময় বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়বে এবং তা শেষ পর্যন্ত শাসক হিসাবে তাঁদের বিরুদ্ধেই যাবে। এই বিক্ষোভ আটকাতে ... ... তাঁরা এবার অনুপ্রবেশকে ইস্যু হিসাবে তুলে এনেছেন। তাঁরা প্রচার করছেন, তোমার চাকরি নেই কেন – অনুপ্রবেশ দায়ী। মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে কেন – অনুপ্রবেশ দায়ী। নতুন কলকারখানা হচ্ছে না কেন – অনুপ্রবেশ দায়ী। বাস্তবে অনুপ্রবেশকে নির্বাচনী ইস্যু করে ভোটে ফয়দা তোলাই তাঁদের আসল লক্ষ্য। ... ... ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা তৈরি করে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে তারা এবার নির্বাচনে জিততে চায়। তাই অনুপ্রবেশের ইস্যুকেই তুরুপের তাস করে মানুষের জীবনকে বাজি রেখে তারা গদির দখল নিতে চায়। বিজেপির এ এক সর্বনাশা ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ।" পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণকে বিভক্ত করতে কিভাবে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগায় তার উদাহরণ আসামের পরিস্থিতি।

সবাই জানেন, রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকে না, বহুমত-বহুধর্মের নাগরিকদের নিয়েই গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার সকল নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু সেই দায়িত্ব অস্বীকার করে চলছে নতুন ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসন।

ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ সবকিছু পায়ে দলে গায়ের জোরে ভারতীয় নাগরিকদের অনুপ্রবেশকারী বা বিদেশি বলে বিতাড়নের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেনি কংগ্রেস, বিজেপিসহ কোনো রাজনৈতিক দল। দুঃখজনক হলেও সত্য, পশ্চিমবঙ্গে টানা ২৪ বছর শাসন করলেও সিপিএমসহ বামপন্থী শক্তিগুলো কংগ্রেস-বিজেপির সুরেই কথা বলেছে। একমাত্র এসইউসিআই(সি) শুরু থেকে আসামের এই উগ্র-সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিকতাবাদী ভ্রাতৃঘাতী ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে।

আরএসএস, শিবসেনার মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলোর উপর ভর করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে মদদ দিয়ে যাচ্ছে শাসক বিজেপি সরকার।

ডি-ভোটার বা ডাউটফুল ভোটার (সন্দেহজনক ভোটার) আসামের সংখ্যালঘুদের জন্য আরেক দুশ্চিন্তার কারণ। ১৯৯৭ সালে নির্বাচন কমিশন ১ লাখ ৩৬ হাজার ভোটারকে কালো তালিকাভুক্ত করে যারা তাদের ভারতীয় নাগরিকত্বের যথোপযুক্ত প্রমাণপত্র দিতে পারেনি। এসকল ভোটাররা এখন অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে।

২০১২ সালে এই অঞ্চলগুলোতে বোদোদের ও মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় চারশত গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সত্তর হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে। বিজেপির অন্যতম শরীক দল বোদো পিপলস ফ্রন্ট (বোপিএফ) বোদোদের স্বার্থে রাজনীতি করে আসছে।

# বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি

(২য় পৃষ্ঠার পর) জায়গায় সমস্ত শক্তিকে সংহত করেছে। জাতীয় নির্বাচনের বিস্তৃতির কারণে এটি সম্ভব নয়। সম্ভব না হলে আওয়ামী লীগের পরাজয় নিশ্চিত। আওয়ামী লীগ সেটা কোনমতেই হতে দেবে না। তার পেছনে দাঁড়ানো ভারত সরকার ইঙ্গিত দিয়েছে যে সকল অবস্থাতেই আওয়ামী লীগ ভারতের সহায়তা পাবে এটা যেন সে না ভাবে। দেশের ভেতরের একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর সাথে কিছু কিছু দ্বন্দ্ব আওয়ামী লীগের হচ্ছে – যা ভেতরের স্তর অতিক্রম করে বাইরেও একটু-আধটু বেরোচ্ছে। যদিও আওয়ামী লীগকে সরানোর ব্যাপারে এদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী কিংবা ভারত সরকার – কেউই সিদ্ধান্ত নেয়ার জায়গায় যায়নি। আবার কিছু চিন্তাভাবনাও তারা যে করছে না তা নয়। কারণ বুর্জোয়া ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে একদিকে শোষণ, অন্যদিকে প্রতারণা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উপর। আওয়ামী লীগ নিয়ে জনগণকে আর বিভ্রান্ত করা যাচ্ছে না। আওয়ামী লীগ পুরোপুরি উন্মোচিত জনবিরোধী শক্তি। জনগণকে বিভ্রান্ত করতে না পারলে নির্মম দমন-পীড়ন ছাড়া রাষ্ট্রের হাতে আর কিছু থাকে না। সঠিক নেতৃত্ব না থাকার কারণে এখনই কোন অভ্যুত্থান সৃষ্টি হচ্ছে না এটা ঠিক, কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। তাই বুর্জোয়া শ্রেণি আওয়ামী লীগের বিকল্পও ভাবছে। গণমাধ্যমে বারবার 'এসকেপ রুট' বলে যে কথাটা আসছে এটা তারই অভিব্যক্তি। অর্থাৎ ক্ষমতা ছাড়লে কোন্ রাস্তা দিয়ে সে বের হবে। তাদের এতদিনের দমন-পীড়নের ফলে সৃষ্ট ও পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ক্ষমতা ছাড়া মাত্রই তাদের প্রতি ভয়াবহ প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে। এটা একটা নৈরাজ্যও তৈরি করতে পারে। সেটাও তাদের একটা চিন্তার দিক।

সেজন্য পরবর্তী সরকার গঠনের সময় কোন দলের হাতে যাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না যায়, ক্ষমতা যাতে বিভাজিত হয়, ক্ষমতার ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে – এ ব্যাপারটি নিয়ে এখন বুর্জোয়া নীতি নির্ধারকরা চিন্তিত। একটা আলোচনা এই সময়ে এসেছে। কামাল হোসেন-বদরুদ্দোজা-মান্নাদের সাথে বিএনপি'র একটা ঐক্য হতে যাচ্ছে। এতে মালয়েশিয়ায় মাহাথির মোহাম্মদের সাথে আনোয়ার ইব্রাহিমের ঐক্য যে প্রক্রিয়ায় হয়েছে, সে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ একটা চুক্তি হবে নির্বাচনের আগে, সেই চুক্তি অনুসারে প্রথম আড়াই বছর প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ পাবেন কামাল হোসেন-বদরুদ্দোজা-মান্নাদের মধ্য থেকে, বাকি আড়াই বছর পাবেন বিএনপি থেকে। এ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় একটা ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা হবে। এই রাস্তাটি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্রিয়াশীল হতে পারে।

এ না হলে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতা না ছাড়লে বা বুর্জোয়ারা বিকল্প রাস্তাকে ক্রিয়াশীল করতে না পেরে আওয়ামী লীগকে রাখার চিন্তা করলে এবং জনঅসন্তোষের মাত্রা এই প্রকারে বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে দেশে যে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হবে, সেটাকে মোকাবেলা করার জন্য আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনীকে মাঠে নামিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারে। সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রয়োজনীয় রদবদল এরমধ্যেই তারা সেরে নিয়েছে। এটি আরও ভয়াবহ মাত্রার দমন-পীড়নের পথ এবং ইতিহাস প্রমাণ করে এই পথের শেষ সমূলে পতনের মধ্য দিয়েই ঘটে।

এই অবস্থা তৈরি হওয়া ঠেকাতে দেশের সবগুলো বিরোধী শক্তি, যারা এই মুহূর্তে সংগঠিত নয়, বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়ে মাঠের লড়াইয়ে নামবে কি? কারণ সবার জন্যই একটা চূড়ান্ত পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার দিকে দেশ যাচ্ছে এবং চূড়ান্ত সময় প্রায় উপস্থিত।

### আমাদের করণীয়

আমরা বামপন্থী দলগুলোকে সবসময় আহবান করে এসেছি নির্বাচনের মোহ ত্যাগ করে আন্দোলনমুখী হওয়ার জন্য। বামপন্থীরা বিভিন্ন ঘটনাতে প্রতিক্রিয়াধর্মী কর্মসূচী পালন করেন, কিন্তু কোন একটা ইস্যু ধরে ধীরে ধীরে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে তাদের তেমন নজর নেই। তাদের সংখ্যা অল্প এটা ঠিক, আবার একটা গণ্ডি ভেঙে, ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যমও তেমন লক্ষ্য করা যায় না। এ সময়ে একদিকে যেমন প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর দমন-নিপীড়নও হচ্ছে ভয়াবহ মাত্রায়। এই অবস্থায় স্থিরভাবে কোন একটা ইস্যু ধরে একটু একটু করে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করলে জনগণের মধ্যে যে মনোভাব এখন আছে তাতে ভাল ফল পাওয়া যেতো। বামপন্থীরাই জনগণের সত্যিকারের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারতো। কিন্তু সেটা এখনও ঘটেনি। নির্বাচন নিয়ে বামপন্থীরা এখনও মগ্ন। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা এক ব্যাপার আর বাস্তব পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে একটু একটু করে বিপ্লবী শক্তি সৃষ্টি করা আরেক ব্যাপার। এই ব্যাপার ধরতে না পারলে অস্থিরতা আসে, রাতারাতি কিছু করে ফেলার চিন্তা আসে। কোন বিপ্লবী শক্তি রাতারাতি কিছু করতে পারে না। দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন ছাড়া মানুষের ভরসার জায়গায় আসতে পারে না। বামপন্থীরা মানুষের ভাবনায় আছে, কিন্তু বাস্তব সাংগঠনিক অবস্থানে নেই। এই অবস্থান এর সাথে-তার সাথে জোট করে, পত্রিকার খবর হয়ে আসতে পারে না, নির্বাচনের জাঁক দেখিয়েও আসতে পারে না। এরজন্য স্থায়ী ও জঙ্গী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবেই। সেই আন্দোলনের রাস্তায় অনেকের সাথেই ঐক্য হতে পারে, কিন্তু একটা লোক দেখানো ঐক্যের কোন মানে নেই।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৮টি বামপন্থী দল মিলে 'বাম গণতান্ত্রিক জোট' গঠন করা হয়েছে। কিন্তু জোটের কেউ কেউ এখনও নির্বাচনকেই তাদের ধ্যান-জ্ঞান করে রেখেছেন। তাদের যে সকল খবরাখবর পত্রিকায় আসে সেখানেও প্রার্থী, কেন্দ্র – এই কথাগুলোই কেবল শোনা যায়। সাংবাদিকদের সাথে জোট নিয়ে যখন তারা আলোচনা করেন তখনও তাকে তারা ভোটের আলোচনার দিকে নিয়ে যান। এই উপসর্গগুলো বজায় থাকলে এই জোটও কার্যকর কিছু দাঁড় করাতে পারবে না। তবে জোটের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু দাবি নিয়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। একটা ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলার শক্তি হিসেবে এই জোট দাঁড়াতে পারলে মানুষ এই অন্ধকারে ক্ষীণ হলেও একটা আলোর রেখা দেখতে পাবে।

একইসাথে কামাল হোসেন-বদরুদ্দোজাদের সাথে বিএনপি'র যে ঐক্য হতে চলেছে, তারা কাকুতি-মিনতি করে কিছুই করতে পারবেন না। নির্বাচন আপাত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলেও আন্দোলন করতে হবে। সবাই মিলে যদি বাম গণতান্ত্রিক জোট উত্থাপিত শর্তগুলো পূরণ না করা পর্যন্ত নির্বাচন সংঘটিত হতে না দেয়ার দাবি তুলে অর্থাৎ–

১. নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করে সব দল ও সমাজের অপরাপর মানুষের মতামতের ভিত্তিতে 'নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তদারকি সরকার' গঠন করতে হবে।

২. নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে বর্তমান জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতে হবে।

৩. জনগণের আস্থাহীন সরকারের অনুগত বর্তমান নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে।

৪. সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ টাকার খেলা ও পেশীশক্তিনির্ভর বিদ্যমান গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে।

এই দাবিগুলো নিয়ে যদি বিএনপি-কামাল হোসেন-বদরুদ্দোজাসহ সমস্ত বিরোধী দল আন্দোলনে নামেন, তাহলে রাজনৈতিক চিত্র ভিন্ন হতে পারে। রাস্তার সাহসী ও সংগ্রামী আন্দোলনের জোয়ারে বামপন্থীদেরও তখন ঐক্যের ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে হতে পারে; তবে সেটা আন্দোলনে নামার পরই, তার আগে নয়।

# সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে বিপর্যস্ত মানবতা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এবং ইন্টেলিজেন্স সহায়তা প্রদান করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। অপরদিকে হুতিদের পেছনে ইরানের সমর্থন রয়েছে বলে জানা যায়। ইরানের বিরুদ্ধে হুতিদেরকে অস্ত্র দেয়ার অভিযোগ থাকলেও ইরান তা বরাবরই অস্বীকার করছে। ২০১৫ সালে হুতিদের সরিয়ে এডেন দখল করে সৌদি জোট। পলাতক প্রেসিডেন্ট হাদী দেশে না ফিরলেও তার সমর্থিত সরকার এডেন থেকে অস্থায়ীভাবে কার্যক্রম শুরু করে। অপরদিকে হুতিসহ অন্যান্যরা সাদা, সানা, হুদেইদাহ প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে। সৌদি জোট ২০১৭ সালে ইয়েমেনে মিসাইল হামলা শুরু করে। এ সময় তারা দেশটির চারিদিকে অবরোধ জারি করে। আকাশপথে অবরোধ জারি করায় মানবাধিকার কর্মীরা দেশটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

### মানবসৃষ্ট সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয়

সৌদি জোটের দাবি জঙ্গি সন্ত্রাস দমনে তারা এ আক্রমণ পরিচালনা করছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের মিসাইলগুলোর বেশিরভাগের লক্ষ্যবস্তু ছিল বেসামরিক স্থাপনা, যেমন-আশ্রয়শিবির, হাসপাতাল, স্কুল, কৃষিখামার, অফিস-আদালত প্রভৃতি জায়গা। ফলাফল গত ৩ বছরে ইয়েমেনে ১০ হাজারের বেশী মানুষ নিহত হয়েছে আর আহত হয়েছে প্রায় ৫৩ হাজার জন। এদের বেশীরভাগই বেসামরিক লোকজন। নিয়মিত বোমাবর্ষণে দেশটির পানি এবং স্যানিটারী ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছে। ফলে কলেরার মত সামান্য রোগও চিকিৎসার অভাবে মহামারীরূপ ধারণ করেছে। ডিপথেরিয়াও মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশটির ৭৫% মানুষের জরুরী মানবিক সহযোগিতা প্রয়োজন। অন্তত সোয়া কোটি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জরুরী খাদ্য সহায়তা দরকার। ৫ বছর বয়সের নিচের প্রায় ৪ লাখ শিশু চরম অপুষ্টিতে ভুগছে। অথচ দেশটির চারিদিকে আবরোধ থাকায় সেখানে মানবাধিকার কর্মী বা ত্রাণ পাঠানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের মতে,"বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবসৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়"।

### আধিপত্য বিস্তারই এই আক্রমণের কারণ

সংশোধনবাদী নেতৃত্বের ফলাফল হিসেবে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভে সাম্রাজ্যবাদ শোষণ লুণ্ঠনের খোলা ময়দান পেয়ে যায়। ফলে মুক্তবাজার অর্থনীতি বা বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো 'উন্নয়ন আর গনতন্ত্রের' বুলি দিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিকে অবাধ লুণ্ঠনের উন্মুক্ত পথ প্রদান করে। আর শোষণ লুণ্ঠনের এই মুক্তবাজার অর্থনীতি নির্ভর করে দেশে দেশে সামরিক শক্তির প্রয়োগের উপরে। যদিও সাম্রাজ্যবাদীরা তা আড়াল করতে চায়। তাই সামরিক শক্তির প্রয়োগের কারণ হিসেবে তারা হাজির করে জঙ্গিবাদের জুজু বা গণতন্ত্র রক্ষার মধুর বুলি। ঠিক এমনটাই ঘটেছে ইয়েমেনের ক্ষেত্রেও। আরব বসন্তের পর ইয়েমেনের খনিজ তেল, বন্দরে মার্কিন আধিপত্য হুমকির মুখে পড়ে। আবার দেশটির সংঘাতের সময় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট সৌদি আরব এবং রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত ইরানের আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। তাই ইয়েমেনে পুনরায় দখলদারিত্ব স্থাপন করতে, সেখানে নিজেদের পুতুল সরকার বসাতে আক্রমণ করে মার্কিন সৌদি জোট। অথচ তা আড়াল করতে আক্রমণের কারণ হিসেবে তারা বলছে জঙ্গি সন্ত্রাস দমনের কথা। বাস্তবে ইয়েমেনে আই এস, আল কায়েদার মত জঙ্গি সংগঠনের উত্থানের পেছনে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই। ১৯৬৭ সালে ইয়েমেন যখন কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে ছিল তখন আফগানিস্তানে তালেবানদের নতুন কর্মী তৈরীর জন্য এ জায়গাকে বেছে নেয় মার্কিনরা। তখনই জঙ্গিবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় ইয়েমেনে। শুধু তাই নয়, বর্তমানেও জঙ্গিবাদে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতার বহু প্রমাণও পাওয়া গেছে। তাই জঙ্গিবাদ দমন নয়, ইয়েমেনে আধিপত্য বিস্তারই এই আক্রমণের প্রধান কারণ।

### শিশু হত্যার অস্ত্র ব্যবসায় বাঁচার পথ খোঁজে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলে জনগনের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে পারে না। ফলে উৎপাদিত পণ্য বাজারে পড়ে থাকে বিক্রি হয় না, অর্থাৎ মন্দা সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা বারবার এই মন্দার মধ্যে পড়ে। আর এই মন্দাবস্থা কাটিয়ে অর্থনীতি সচল রাখতে অর্থনীতির সামরিকীকরণ এই ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর সামরিক খাত চাঙ্গা রাখতে প্রয়োজন যুদ্ধের। লেনিন বলেছেন "সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবে যুদ্ধের জন্ম দেয়"। কমরেড শিবদাস ঘোষ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সামরিকীকরণ আরও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, পুঁজিবাদ এখন অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতে সামরিক উৎপাদন করছে এবং সেজন্য বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে না পারলেও সর্বদা ছোটখাট যুদ্ধ করছে, তাও না পারলে সর্বদা যুদ্ধের হুমকি বজায় রাখছে। আর তার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখি যে, মিথ্যাচার করে ইরাকে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে মার্কিনিরা। এই রক্তাক্ত ইতিহাস আরও রচিত হয়েছে যুগোশ্লাভিয়া, আফগানিস্তান, লেবানন, হাইতিসহ ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। ইয়েমেন আক্রমণের হেতুও এর ব্যতিক্রম নয়। মরণাপন্ন মার্কিন পুঁজি প্রাণ বাঁচাতে ইয়েমেনে শিশু হত্যার অস্ত্র বিক্রির পথ বেছে নিয়েছে। ১০ অক্টোবর ২০১৬ ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল থেকে জানা যায় এই আক্রমণের জন্য সৌদি আরবের কাছে প্রায় ১.১০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাজ্য বিক্রি করেছে ১ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের বৃটিশ জেট, বোমা এবং মিসাইল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৭ সালের মে মাসে সৌদি আরব সফরকালে ১১০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি চুক্তি করেছেন। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে সৌদি আরবের কাছে আরও ৬৭০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি চুক্তি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে সাম্রাজ্যবাদ মুখে শান্তিরক্ষার কথা বলে অস্ত্র ব্যবসার মাধ্যমে বাজার চাঙ্গা রাখতেই চালাচ্ছে রক্তের এই হোলি খেলা। আর বিশ্বের মানবিক মানুষের কাছে এই নোংরামো আড়াল করতে বলছে এ যুদ্ধ শিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্ব, এ সমস্যা জঙ্গিবাদের আর তাদের ভূমিকা ত্রাতার। আর এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ ভূমিকা পালন করছে নীরব দর্শকের।

### ধর্মের মোড়ল সৌদি আরবের হাত আজ মুসলমানের খুনে রঞ্জিত

সৌদি আরবের ইয়েমেন আক্রমণ প্রমাণ করে দিল যে কথায় কথায় ইসলামের দোহাই দেয়া সৌদি আরব ইসলামকে ন্যূনতম তোয়াক্কা করেনা। তা না হলে ইয়েমেনের উপর এমন ধ্বংসযজ্ঞ তারা চালাতে পারতো না। সৌদি আরব মুসলিম দেশ নিয়ে কনফারেন্স করে, দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর জন্য সারা বিশ্বের হাজার হাজার ইসলামী সংগঠনকে বরাদ্দ দেয়– অথচ নিজে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে হামলা চালায় যার বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান। সে দেশের শিশুদের সে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। যে ধরনের যুদ্ধই চলুক না কেন, যুদ্ধ চলাকালে শিশুদের উপর আক্রমণ কোন নীতির মধ্যে পড়ে না। এই সামান্য নিয়মটুকু না মেনে নির্মমভাবে স্কুলবাসে হামলা চালালো সৌদি আরব। যারা সৌদি টাকায় সংগঠন গড়ে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দেন, তাদের একটু ভাবা উচিত, আদতেই দ্বীন বলে কোন ব্যাপার সৌদি আরবের আছে কি না, আরবের মোড়ল দেশগুলোর আছে কি না। আরব বিশ্বের আর কোন দেশও এর প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ করেনি বাংলাদেশের তথাকথিত ইসলামী দল ও সংগঠনগুলো।

### সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই বাঁচার একমাত্র পথ

ইয়েমেনে একের পর এক ভয়াবহ আক্রমণের পর সে দেশে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও প্রতিরোধ গড়ে তুলছে সে দেশের মানুষ। সৌদি জোটের আক্রমণের এক বছর পূর্তিতে মিছিল বের করেছে লাখো জনতা। তারা বলেছে "আমাদের সমস্যা সমাধানে বাইরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। আমাদের সমাধান আমরাই খুঁজে নেব।" সাম্রাজ্যবাদী এ আক্রমণের প্রতিবাদ করছে সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ। মার্কিন দেশের সাধারণ মানুষও এই সমস্ত আক্রমণের প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নামছে। ফলে এক মেরু বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ অনায়াসে শোষণ-লুণ্ঠন চালানোর যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা ল্যাটিন আমেরিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের জনতার মত ইয়েমেনের জনতাও চুরমার করে দিচ্ছে। আর এ পরিস্থিতিতে এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে বাংলাদেশের জনতাকে বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তার সাথে তাদের বুঝতে হবে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের স্বার্থের কাছে ধর্ম কোন ব্যাপার নয়, ধর্ম তাদের কাছে ব্যাপার হয় তখনই যখন তাদের স্বার্থে এর অনুভূতিকে ব্যবহার করার দরকার হয়।

### জাতীয় কমিটির সংবাদ সম্মেলন

# জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং প্রাণ প্রকৃতি বিনাশী প্রকল্প বন্ধের দাবি

তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সুন্দরবনবিনাশী সকল বাণিজ্যিক তৎপরতা বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া সকল রাজনৈতিক দলের কাছে সুন্দরবন রক্ষায় রামপালসহ বিভিন্ন বিষাক্ত প্রকল্প বন্ধের দাবিকে তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, শুধু রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নয়, এই কেন্দ্রের কারণে প্রলুব্ধ হয়ে দেশের বনগ্রাসী ভূমিগ্রাসী কতিপয় গোষ্ঠী তিন শতাধিক বাণিজ্যিক প্রকল্প নিয়ে সুন্দরবন ঘিরে ফেলেছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, গত কয়েক বছরে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, উন্মুক্ত কয়লা খনি, এলএনজি এবং এলপিজি'র লবিস্ট কোম্পানীর স্বার্থে কাজ করে যাওয়া ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দৌরাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রণালয় এখন তাদেরই দখলে। সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক প্রকল্প তাই এখনও বাতিল হয়নি, উপরন্তু কোনো প্রকার পরিবেশ সমীক্ষা না করে দেশের বিদ্যমান পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে উপকূল রক্ষাকারী বন বিনাশ করে মহেশখালি, বরগুনা ও পটুয়াখালিতেও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। সুন্দরবনের ঘাড়ের ওপর বসানো হচ্ছে এলএনজি প্লান্ট।

৬ অক্টোবর, সকাল ১০.৩০ মিনিটে পুরানা পল্টনস্থ মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠন করেন সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। বক্তব্য রাখেন আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও সংগঠক রুহিন হোসেন প্রিন্স। এসময় টিপু বিশ্বাস, বজলুর রশীদ ফিরোজ, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, নজরুল ইসলাম, বহ্নি শিখা জামালী, প্রকৌশলী কল্লোল মোস্তফা, জাহাঙ্গীর আলম ফজলু, শামসুজ্জোহা, নাসিরউদ্দিন নাসু, মহিন উদ্দিন চৌধুরী লিটন, শহীদুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে রূপপুর প্রকল্পের ব্যয়, পরিবেশ সমীক্ষা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে সরকারের শ্বেতপত্র দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় দুটো দায়মুক্তি আইন বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে রাহুর মতো চেপে আছে। এর একটি ২০১০ সালে প্রথমে ৪ বছরের জন্য বহাল করা হয়, এরপর তার মেয়াদ কয়েক দফা বাড়ানো হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে গৃহিত সকল প্রকল্প দরপত্র ছাড়া, বিদ্যমান আইনী বাধ্যবাধকতার বাইরে গিয়ে বাস্তবায়ন করার এখতিয়ার নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক আদালতের দারস্থ হতে পারবে না। এই দুর্নীতি অনিয়মের কারণেই একের পর এক অসম্ভব ব্যয়বহুল ক্ষতিকর প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের তফসিলের আগে এসব দায়মুক্তি আইন বাতিল, সকল রাজনৈতিক দলকে তাদের ইশতেহারে দায়মুক্তি আইন বাতিল করে সর্বজনের সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার দাবি যুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ফুলবাড়ীতে জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিও জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় সরকার দেশি-বিদেশি লুটেরাদের স্বার্থে জাতীয় সম্পদ ধ্বংসের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। একমাত্র গণআন্দোলনই জাতীয় সম্পদ সুরক্ষায় সরকারকে বাধ্য করতে পারে। সচেতন মানুষকে এই আন্দোলনে শরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

## ইয়েমেন সংকট:
## সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে বিপর্যস্ত মানবতা

কয়েকদিন আগে পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাতে গিয়ে একটি ছবি দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠেনি এমন মানুষ বিরল। ছবিতে সারি সারি ছোট ছোট কবর। সৌদী বোমায় ইয়েমেনের সাদা প্রদেশের স্কুলবাসে হামলা করে হত্যা করেছে ৪০ শিশুসহ মোট ৫১ জনকে। শুধু তাই নয় এই নৃশংস হামলাকে যৌক্তিক বলেও দাবী করে সৌদি আরব। পরে অবশ্য আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে এই বক্তব্য ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয় তারা। সম্প্রতি আবার বোমা হামলায় সৌদি জোট হত্যা করেছে আরও ২২ শিশুকে। ইয়েমেনে এই হত্যাকান্ড চলছে ২০১৫ সাল থেকে। সাম্রাজ্যবাদী নকশা বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে সৌদি-আরব আমিরাত জোট আর মদদদাতা হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স।

**অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ**

সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে 'আরব বসন্ত' শুরু হলে তার হাওয়া ইয়েমেন এসে পৌছায়। ১৯৯০ সাল থেকে ইয়েমেনে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। ফলে এ সময়ে সরকারগুলো ছিল পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণকারী। শোষণ-লুণ্ঠনে অতিষ্ঠ জনতার প্রতিরোধে প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহ তার ডেপুটি আবদারাবুহ মানসুদ হাদীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আরব বসন্তের অন্যান্য দেশের মতই সঠিক রাজনৈতিক মতাদর্শের নেতৃত্বের অভাবে পূর্বের ধারাবাহিকতায় দেশ পরিচালিত হতে থাকে। তাই বিক্ষোভ আবারও দানা বাঁধে। আর এ সময়েই বিদ্রোহী হুতি আন্দোলনের কর্মীরা সাদা প্রদেশ দখল করে নেয়। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজনও হুতিদের সমর্থন জানায়। এরপর তারা রাজধানী সানার নিয়ন্ত্রণ নেয়। এ পর্যায়ে হুতিরা আর নিরাপত্তাবাহিনীগুলো প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহ এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। প্রেসিডেন্ট হাদী এ সময় দেশ থেকে পালিয়ে যায়। আর এ পরিস্থিতির সুযোগ নেয় স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলো। প্রেসিডেন্ট হাদীকে পুনর্বহাল করতে ২০১৫ সালে সৌদি আরব আরও ৮টি ইসলামিক দেশসহ জোটবদ্ধ হয়ে ইয়েমেনে আক্রমণ পরিচালনা করে। এই জোটকে লজিস্টিক *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

## প্রসঙ্গ আসামের এনআরসি তালিকা:
## সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ষড়যন্ত্রে নিজ দেশে পরবাসী লাখো ভারতীয়

ভারতের আসাম রাজ্যে মোট জনসংখ্যার ৩৪ শতাংশ মুসলিম। অর্থ্যাৎ প্রতি তিনজনে একজন মুসলিম। ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের পর এ অঞ্চলটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। আসামের ৩৪টি জেলার নয়টি মুসলিম অধ্যুষিত। সেখানকার ৩৫টি প্রাদেশিক পরিষদ আসনের নির্বাচনের ভাগ্য মুসলিম ভোটারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আসামের নির্বাচনে আসম গণ পরিষদ (এজিপি) এবং বিজেপি এই পরিসংখ্যান ব্যবহার করে আসামের বাংলাভাষী মুসলিমদের অধিকাংশ আসামে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী বলে অভিযোগ তুলে তাদের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

বিদেশী বিতাড়নের নামে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী সাম্প্রদায়িক হামলা-মামলাসহ নির্যাতনের পর রাষ্ট্রীয়ভাবে গায়ের জোরে নিজ নাগরিকদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। নতুন করে তথাকথিত এনআরসি বা জাতীয় নাগরিক পঞ্জি তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার আসামে উস্কে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক সংঘাত – যেখানে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়। কখনও বলছে ৪০ লাখ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী, কখনও আবার বলছে ৫০ লাখ অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে আসাম। তাই তাদের দেশ থেকে বিতাড়ন করতে হবে – এমন হুংকার দিয়ে আসছে দেশটির সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো। যার পেছনে মদদ রয়েছে বর্তমান শাসক দল বিজেপিসহ পূর্বতনরা।

ভারতের সেভেন সিস্টার খ্যাত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসামে এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি কারা সৃষ্টি করলো এবং এখান থেকে মুক্তির উপায় কী – তা জানতে একটু পেছনে ফেরা যাক। ১৯৭৯ সালে বৃহত্তর আসামসহ পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতে তথাকথিত অনুপ্রবেশের ধুয়া তুলে সৃষ্টি করা হয়েছিল ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা। এসব শক্তির প্ররোচনায় সংবাদমাধ্যমগুলোতে খবর তুলে ধরা হয় বিদেশী তথা বাংলাদেশী নাগরিকে ভরে যাচ্ছে আসাম, ত্রিপুরাসহ পুরো এলাকা। তাই তাদের বিতাড়ন করতে হবে। ভারতবর্ষের নীতি অনুযায়ী যারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে ভারতে এসেছেন তারাই ভারতীয় নাগরিক। ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বছর ধরে নাগরিকত্বের বিষয়টি মেনে নিয়েছিল আসামের রাজনৈতিক দলগুলো। এমনকি ১৯৮৫ সালে 'আসু' ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল, যা আসাম চুক্তি বলে পরিচিত সেখানেও নাগরিকত্বের ভিত্তি বছর ধরা হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। স্বদেশি নির্ধারণে দুইবারের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহন্তের শাসনে ৬/৭ বার নাগরিকত্ব পরিচয় দিতে হয়েছে সংখ্যালঘু মুসলিম আসামী জনগোষ্ঠীর। এমনই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে ঐ ১০ বছরের বাংলাদেশী খেদাও আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনো কর্মসূচী ছিল না। একদিকে শোষণ-বঞ্চনায় জর্জরিত পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প কল-কারখানা স্থাপন না করায় দ্রুত গতিতে বাড়ে দারিদ্র্য। অন্যদিকে বাড়তে থাকে জাত্যাভিমান। যার ফলাফল হিসেবে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ, পৃথকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসার ঘটতে থাকে।

৪০/৫০ লাখ বিদেশী খুঁজতে অনুসন্ধানে কাজ শুরু করে রাজ্য সরকার। কিন্তু বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোর মতো উবে যায় লাখ লাখ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর প্রচারণা। রাজ্য সরকারের অনুসন্ধানে মাত্র ৭/৮ হাজার অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত হয়। সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রোপাগান্ডা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সত্য প্রকাশিত হওয়ায় চক্রান্ত শুরু হয় মুসলিম সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা করতে। ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে ৩ লাখ ৭০ হাজার মুসলিম আসামবাসীকে সন্দেহজনক ভোটার বা ডি ভোটার বানানো হয়েছিল। গায়ের জোরে প্রায় ১৪/১৫ বছর তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। পরবর্তীতে আদালতে উপযুক্ত প্রমাণপত্র দেখিয়ে প্রায় দেড় লাখ মানুষ ভোটের অধিকার ফিরে পায়। বাকীদের উপযুক্ত (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

## ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায় প্রসঙ্গে বাসদ (মার্কসবাদী)-র প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, "২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের জনসভায় তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে মৌলবাদী গোষ্ঠী পরিচালিত গ্রেনেড হামলায় সেসময় ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের একটি অংশ যেভাবে মদদ দিয়েছিল তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক অশুভ কালো অধ্যায় রচনা করেছিল। তৎকালীন বিএনপি সরকার ২১ আগস্ট নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দায় এড়াতে পারে না শুধু নয়, তারা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ও নিষ্ঠুরভাবে হামলার শিকার আওয়ামী লীগকেই এর জন্য দায়ী করেছিল, জজ মিয়া নাটক সাজিয়ে তদন্ত ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছিল, গ্রেনেড সরবরাহকারী মাওলানা তাজউদ্দিনকে দেশ ছেড়ে পালাতে সাহায্য করেছিল, হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নানের স্বীকারোক্তি গোপন করেছিল। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার শীর্ষ পদাধিকারীরা শাসক দলের প্রভাবশালী মহলের ইঙ্গিতে এসব কাজে সাহায্য করেছিলেন। গণবিরোধী শাসকদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি কিভাবে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয় তা এখান থেকে বোঝা যায়। ফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও হত্যা-ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসানে ওই বর্বরোচিত হামলায় অংশগ্রহণকারী, নেপথ্যে মদদদাতা ও সহায়তাকারী সকলের বিচার ও শাস্তি যেকোন বিবেকবান মানুষের কাম্য। বিলম্বে হলেও এ মামলার রায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অন্তত একধাপ অগ্রগতি ঘটাবে – এটাই আমাদের প্রত্যাশা।"

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, "কিন্তু, একইসাথে আমরা বলতে চাই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে বিরোধী দলকে দমন ও নিছক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ মামলার রায়কে দেখছে বলে জনমনে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যাণ্ডেট ছাড়াই দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় দেশ চালাতে গিয়ে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিনা বিচারে হত্যা-গুম-নির্যাতন-মিথ্যা মামলা ও ষড়যন্ত্রের একই পথ অনুসরণ করছে। এই সরকারের আমলে নারায়ণগঞ্জের তুকী, সাংবাদিক সাগর-রুনি, বিএনপি-র ইলিয়াস আলী, কুমিল্লা সেনানিবাসে তনুসহ অনেক চাঞ্চল্যকর হত্যা-গুমের বিচার হয়নি। দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা জেনারেল মঞ্জুর হত্যা মামলা, পল্টনে সিপিবি-র সমাবেশে ও রমনা বটমূলে নৃশংস বোমা হামলা ইত্যাদি সুরাহার কোনো লক্ষণ এখনো নেই। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অগণতান্ত্রিক পন্থায় নির্মূল করার ফ্যাসিবাদী মানসিকতা বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ডেও প্রতিফলিত হচ্ছে। বিচারব্যবস্থা-প্রশাসন-পুলিশসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে বর্তমানে যেভাবে দলীয়করণ, নিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণে ব্যবহার করা হচ্ছে তা নজিরবিহীন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মত কালো আইন করে গণমাধ্যম ও নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের এই অগণতান্ত্রিক ভূমিকা ও চরিত্রই মামলার রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং বিএনপি-র মধ্যে যারা ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার সাথে যুক্ত ছিলেন বা হামলাকারীদের আড়াল করেছেন তাদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্র তৈরি করছে।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আরও বলেন, "দেশে যখন অগণতান্ত্রিক শাসন চলে, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না – তখন সেই ব্যবস্থার অধীনে যেকোন বিচারের পশ্চাতে শাসকদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দেশের জনসাধারণকে বুঝতে হবে, আওয়ামী লীগ-বিএনপি এসব ধনিকশ্রেণীর দলগুলো আজ আর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সত্যিকার অর্থে ধারণ করে না। বিশেষ করে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোটাধিকার পুরোপুরি হরণ করে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক শাসন ও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের বুর্জোয়া সংসদীয় পদ্ধতিকেও অকার্যকর করে তুলেছে। ফলে আওয়ামী স্বৈরতান্ত্রিক দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ভোটাধিকারসহ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের পথেই জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে।"

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org